পাইরেটস' ডেনের

মেছোবই

দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৮

সম্পাদক
অরিত্র ভট্টাচার্য্য

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সৌম্য সরকার, পবিত্র পাল, শুভদীপ দাস,
জ্যোতির্ময় রায়, সঞ্জীব পাত্র, অভীক ঘোষ

প্রচ্ছদ
পবিত্র পাল

প্রকাশক
অর্জন বসু রায়

মুদ্রণ
বর্ণনা প্রকাশনী
৬/৭, বিজয়গড় কলকাতা-৭০০০৩২
দূরভাষ: ৯৮৭৪৩৫৭৪১৪

মেছোবই

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মহালয়া, ১৪২৮

সূচীপত্র

১. উৎসবমুখর মাছ - অরিত্র ভট্টাচার্য্য।

২. প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের রকমফের - অভীক ঘোষ।

৩. বিরল বোরালি কথা - শ্রয়ণ ভট্টাচার্য।

৪. বিশেষ আকর্ষণ - আগামীর মেছো।

৫. পার্কুলা ক্লাউন ফিশ - শুভদীপ দাস।

৬. এক ক্ষুদে রাক্ষুসে মাছের কাহিনী - তথ্যপ্রিয় দাস।

৭. বিপন্ন মাদাগাস্কার - সঞ্জীব পাত্র।

৮. মাছের বাবা মাছের মা - সৌম্য সরকার।

৯. ফিশ-ফাঁস - সঞ্জীব সাহা।

১০. বিশেষ আকর্ষণ - মাছ-চিত্র।

১১. জঙ্গলমহলের কুড়মি জনজাতির মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি - রাকেশ সিংহ দেব।

১২. বেরঙিন - পবিত্র পাল।

সম্পাদকের কথা

বৈশাখ মাস আর আশ্বিন মাস, বাঙালির ক্যালেন্ডারে উৎসবের কৌলিন্যের দিক দিয়ে এই দুই মাসের জুড়ি মেলা ভার। প্রথম জনের নববর্ষ, হালখাতার উৎসব তো দ্বিতীয় জনের খাতায় মা দুর্গা নিজে তাঁর আগমনী লিখে গেছেন। এই দুই উৎসবের মাসের আনন্দ আরো একটু বাড়িয়ে দিতে, বিশেষ করে মৎস্য ও পরিবেশপ্রেমী মানুষদের কাছে, আমরা 'পাইরেটস ডেন'-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করি আমাদের আপনাদের সকলের প্রিয় বাঙলা ভাষার সর্বপ্রথম মাছ ও জলজ প্রকৃতি সংক্রান্ত ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা 'মেছোবই'। অনেক পর্যালোচনার পরে 'মেছোবই'-এর প্রথম নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরে পরেই আপনাদের সকলের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা এবং উৎসাহ আমাদের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্ত রকম দ্বিধাকে এক ধাক্কায় উড়িয়ে দেয়। আমরা বরং উৎসাহী হয়ে পড়ি যে কীভাবে 'মেছোবই'-এর মানকে আরো বাড়িয়ে তোলা যায়, কীভাবে 'মেছোবই' -কে এমন এক ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত করা যায় যার পাঠক হিসাবেও আপনারা গর্ববোধ করতে পারেন। নিজেদেরকে ক্রমাগত উন্নত করার এই প্রক্রিয়া কেবলমাত্র আপনাদের ভালোবাসার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই অতিমারীর কঠিন প্রকোপের মধ্যে থেকে সামাজিক দূরত্ববিধি বজায় রেখে, নিজেদের জীবিকার কাজকে বজায় রেখে শুধুমাত্র ডিজিটাল কথোপকথনের মাধ্যমে একটা গোটা ম্যাগাজিন ডিজিটালি ছাপানোর যে কর্মকাণ্ড তার উৎসাহও আমরা পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকেই।

'মেছোবই' এর প্রথম পর্ব প্রকাশের পরে আমরা অনেক শুভাকাঙ্খীর পক্ষ থেকে অনেকেই পরামর্শ পেয়েছিলাম আমাদের পত্রিকার মানোন্নয়নের বিষয়ে। তার মধ্যে অনেকেই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন এই মানের একটা পত্রিকার বিনিময় মূল্য রাখতে, অবশ্যই আমাদের ভালোর কথা ভেবেই। তাঁদের পরামর্শকে যথাযথ সম্মান দিয়েও আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা জ্ঞানকে বিনিময় প্রথার মধ্যে আনবো না। তাই গতবারের মতো এবারেও 'মেছোবই' থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই কর্মকাণ্ডের কিছু খরচা তো থাকেই। তাই আমরা 'মেছোবই'-এর পাতায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার আহ্বান জানাই। সেখানেও আমরা বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে অনেক মানুষের ভালোবাসার দান পাই। কোনো নাম বা মুখের দোহাই দিয়ে নয়,তাঁরা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র পত্রিকার মানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এই পত্রিকা চালানোর পথে অর্থ যাতে কোনো সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য নিঃস্বার্থে আমাদের দান করেছেন। একটি বিনামূল্যে পরিবেশিত ই-ম্যাগাজিনের পক্ষে এর থেকে বড়ো পাওয়া বোধহয় আর হয় না বর্তমান পরিস্থিতিতে।

'মেছোবই'-এর দ্বিতীয় পর্ব হলো পুজোসংখ্যা, আর এই পুজোসংখ্যা নামটার সঙ্গেই আমাদের প্রায় সবারই ছোটোবেলা থেকেই আলাদা ভালোলাগা জড়িয়ে আছে। আমাদের প্রিয় পত্র-পত্রিকার নতুন সংখ্যা, তাতে একসঙ্গে অনেক প্রিয় লেখক-লেখিকাদের সৃষ্টি! সব মিলিয়ে এমন একটা কিছু যা ছুঁলে পাওয়া যায় পুজোর আনন্দের গন্ধ। সময় পাল্টেছে, বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা 'মেছোবই'-এর পাতার স্পর্শ আপনাদের দিতে অপারগ হলেও (যদিও অনেকেই 'মেছোবই'-এর প্রথম পর্বকে প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছিলেন।) চেষ্টা করেছি আমাদের বিষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যতোটা সম্ভব পুজোর আনন্দের অনুভূতি আপনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। গতবারের মতো এবারেও থাকছে বিভিন্ন স্বাদের একাধিক লেখা যার কিছু একদমই নতুন, আর কিছু পরিমার্জিত যা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আগে লেখা হয়েছিল এবং আপনাদের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। এছাড়াও পুজোসংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকছে আমাদের দুটি নতুন বিভাগ। একটি হলো 'আগামীর মেছো' যার উদ্দেশ্য আমাদের বাড়ির খুদে সদস্যদের মধ্যে মাছ ও জলজ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করা। আর একটি হলো "মাছ-চিত্র" যেখানে প্রকাশিত হয়েছে মাছের ওপর করা প্রথম বাঙলা কমিক্স! সব মিলিয়ে এবারের 'মেছোবই' আপনাদের সামনে আসছে আরো পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়ে, পুজোর নতুনত্বের গন্ধ মেখে।

অন্তিমে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হলো কিনা, গতবারের মতো এই সংখ্যার ক্ষেত্রেও তার বিচারক আপনারাই। সমস্ত ভালোলাগা-মন্দলাগা, ঠিক-ভুল, পরামর্শ নির্দ্বিধায় জানান আমাদের। আমরা গন্তব্যের থেকেও যাত্রায় বেশি বিশ্বাসী। আর আমাদের এই যাত্রাপথের সুসময়-দুঃসময়ের সঙ্গী আপনারাই। তাই পাশে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন।

অ্যাডমিন এবং মডারেটার, পাইরেটস ডেন।

।। উৎসবমুখর মাছ।।

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

মাছের রঙ্গোলি

“কটু তৈলে ভেজেছি দশ পণ কই আর তাতে দিয়েছি আদারস।... চিতলের কোল ভেজেছি অত পণ কিন্তু পোড়েনি একটিও। রোহিত মৎস্যের ঝোল বেঁধেছি কুমুড়া আর বড়ি দিয়ে।..রন্ধনের পাকে ধন্যি ধন্যি করেছিল বান্যাকুল। ভেজেছি বেশ ক-ধামা কুমুড়ার ফালি আর চিংড়ার বড়া... মধুমুখে খেয়েছিল ব্যান্যাসমাজ”

—রামকুমার মুখোপাধ্যায়। (‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’)

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর এই পার্বণ উদ্‌যাপনের অন্যতম মাধ্যম হল বাঙালির প্রিয় মাছ। এখন বাজারে যতোই মাংসের রমরমা চলুক না কেন, নদীমাতৃক বাঙলাদেশের রক্তে কিন্তু সেই আদিকাল থেকেই আছে মাছের প্রতি প্রেম, সাধে কি আর বলে মাছে-ভাতে বাঙালি! এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কবিতা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গায়িক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।

কবিতাটি চতুর্দশ শতাব্দীর কবিতাসংকলন ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ থেকে উদ্ধৃত। এর মানে যে নারী স্বামীকে কলাপাতায় ঘি,গরম ভাত, মৌরলা মাছ আর নালতে শাক খেতে দেন তাঁর স্বামী পুণ্যবান! এখনো স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক শুরুর দিনটিতে, মানে বিবাহ উৎসবে মাছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গায়ে হলুদের তত্ত্বতে মাছের উপস্থিতি শুভ নবজীবনের এবং সমৃদ্ধির সূচক। ছেলের বাড়ি থেকে হলুদ, সিঁদুর, পান ও নতুন কাপড় দিয়ে সাজানো বড়ো রুই মাছ পাঠানোর অর্থ তারা নববধূকে তার নতুন জীবনযাত্রার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন। একই ভাবে নববধূ বিয়ের পরদিন প্রথমবার স্বামীর বাড়ি এলে তাকে জ্যান্ত মাছ ধরাবার প্রথার প্রচলন। এক্ষেত্রে মাছ সমৃদ্ধি ও লক্ষ্মীর প্রতীক যা থাকবে নববধূর হাতে। আবার সেই নববধুই অন্তঃসত্ত্বা হলে তাকে খাওয়ানো হয় রুই মাছের ল্যাজা। সন্তান জন্মানোর পর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ মাছের মাথা ছাড়া। আর বাঙালির উৎসবের ভোজসভায় তো মাছের স্থান সবার ওপরে। এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচনায় মজার বিবরণ দিয়েছেন, ‘আমরা ছোকরার দল লোলুপ দৃষ্টিতে (মাছের) মালসার দিকে আর পাতের দিকে চাহিতে লাগিলাম, যদি লুচিতে আর মাছেতে সংযোগ হয় ত সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তখনই পাই।’ কৃষ্ণনগরের মহারাজ সৌরীশ চন্দ্র রায়ের পাকা দেখা অনুষ্ঠানের মেনুতেই খালি মাছের পদ ছিল আট রকমের! শুধুমাত্র বাঙলাদেশেই নয়, ওড়িশাতেও উৎসবে মাছের প্রচলন আছে। সেখানে বিয়ের মণ্ডপে যে আলপনা আঁকা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল মৎস্য-পদ্ম। একটি পদ্মকে বেষ্টন করে থাকা এক জোড়া মাছ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। আলপনার কথাই যখন এলো তখন বলে দেওয়া যাক যে আলপনা, যা বাঙালি তথা ভারতের বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে মঙ্গল ও উৎসবের প্রতীক, তার মধ্যে অন্যতম মঙ্গলসূচক চিহ্ন হল মাছ। রঙ্গোলিতে মাছের চিহ্নের ব্যবহার বহুল। মাছকে এক্ষেত্রে মনে করা হয় মঙ্গল ও উর্বরতার প্রতীক কারণ মাছের আকৃতি অনেকটা যোনির মতো। আর উৎসবের সময় অনেক অবাঙালি এবং বাঙালি মহিলারা রুপোর মাছের কানের দুল পরতে ভালোবাসেন। কিন্তু খুব কম মহিলা এটা জেনে পরেন যে এর আসল কারণ হল যাতে কোন খারাপ নজর না লেগে যায়। হ্যাঁ, মাছ দুষ্ট নজর প্রতিহত করে।

‘তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাণ্ডার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এল বর্ষা, ইলিশ উৎসব।’

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসবে মাছ তো হলো, এবার একটু নজর দি মাছের উৎসবের দিকে। আমাদের দেশের অন্যতম বিখ্যাত মৎস্য উৎসব হল রাজস্থানে আলোয়ারের শীতকালে অনুষ্ঠিত মৎস্য উৎসব। প্রাচীন বিশ্বাস ও পুরাণ মতে মাছ হলো বিষ্ণুর একটি অবতার ও একই সঙ্গে মানুষের রক্ষাকর্তা। সেই যে মনুর গল্পে মাছের কথা আছে যে নাকি বন্যার সময় মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল, সেই তো মৎস্যাবতার। আর এই আলোয়ার প্রদেশটি নাকি আগে ছিল সেই ইতিহাস বই-এ পড়া ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম মহাজনপদ-মৎস্য ব্যাস, এই দুই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই বর্ণাঢ্য উৎসব। একাধিক দিন ধরে চলা এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। সঙ্গে তো স্থানীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান রয়েছেই। আর রাজস্থানের উৎসবে আর যারই কমতি থাকুক রঙের কমতি থাকবেই না। এরপর বলি কর্ণাটকের ধর্মারাসু শ্রী উল্লায়ার মন্দিরের মৎস্য উৎসবের কথা। মে মাসের বৃষভ সংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে মন্দিরে পুজো দিয়ে সেই প্রসাদ মন্দির সংলগ্ন নদীতে উৎসর্গ করে স্থানীয়রা নদীতে মাছ ধরতে নামেন। সারাদিন মাছ ধরার শেষে সেই মাছ দিয়ে আগে দেবতার ভোগ তৈরি হয়, তারপর সবার মধ্যে সেই মাছ ভাগ করে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান ওই অঞ্চলের ধীবরদের মধ্যে মাছ ধরার সিজনের শুরুর দিন, তাই বলাই বাহুল্য এই উৎসব বিশেষ আনন্দ বয়ে আনে এই একই ধরনের কেরলের উৎসব হল পায়ান্নুর মীনামৃতু উৎসব। পায়ান্নুর অঞ্চলের অষ্টমাচল ভগবতীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে এপ্রিল মাসে এই উৎসব হয় এবং একই ভাবে দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় ধরা মাছ। মনে করা হয় এতে সারা বছর মাছের অভাব ঘটবে না। কর্ণাটকের মীনু হাব্বা উৎসব হলো আরো একটা প্রায়

দুশ বছর পুরোনো বাৎসরিক মৎস্য উৎসব যা হাভেরি, কারওয়ার অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে পালিত হয়। এই উৎসবে ধরা মাছের বিক্রির টাকা কিছুটা মন্দিরের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা হয়, বাকিটা সাধারণদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর কালাদ্ধিরি মুথানস্বামী থিরুকোভিল মন্দিরেও একই রকম উৎসব হয়। তফাৎ হল এক্ষেত্রে নদীর বদলে মন্দিরের বিশাল পুকুরে এই অনুষ্ঠান হয় এপ্রিল মাসে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রায় শুকিয়ে যাওয়া পুকুর থেকে সব মাছ তুলে নেওয়া যাতে আবার পরের বছরের জন্য মাছ ছাড়া যায়। প্রায় একশ বছরের পুরোনো এই উৎসবে যোগ দিতে আশেপাশের অঞ্চল থেকেও অনেকে এসে আগের দিন থেকে অপেক্ষা করেন। তবে এই মাছ বিক্রি করা হয় না সাধারণত। যাঁরা ধরেন,তাঁরা বাড়িতে নিয়ে এই মাছ নিজেরাই খান পূণ্যলাভের আশায়। তামিলনাড়ুরই পেরামবালুর জেলার আন্নামঙ্গলম গ্রামের দেবোত্তর পুকুরেও বছরে একদিন চলে মাছ ধরার উৎসব। এখানের বৈশিষ্ট্য হল ছিপ দিয়ে মাছ ধরার পাশাপাশি কমা জলে ধুতি দিয়ে মাছ ধরা। আশেপাশের প্রায় ২৫ টি গ্রামের মানুষ জড়ো হন এই উৎসব দেখতে বা অংশ নিতে।

কালাদ্ধিরি মুথানস্বামী মন্দিরের মৎস্য উৎসব

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এবার যাওয়া যাক পূর্বাঞ্চলের দিকে আসামের পানবাড়ির গোরাইমারি লেকে অনুষ্ঠিত হয় ভোগালি বিহু উৎসব যার অন্যতম অঙ্গ হলো লেকের জলে একসঙ্গে মাছ ধরা ও একসঙ্গে খাওয়া। এর উদ্দেশ্য হলো দেবতাকে তুষ্ট রাখা যাতে অতিগ্রীষ্ম না আসে। মণিপুরের খাইরি কাষাও হল এমনই এক মৎস্য উৎসব যা হয় ওই মার্চ এপ্রিল মাসে বীজ বোনার

আসামের ভোগালি বিহু উৎসব

পরে সবাই মিলে একসঙ্গে মাছ ধরার মাধ্যমে বৃষ্টির দেবতাকে আহ্বান জানানো হয় মাটিকে উর্বর করার জন্য মাটি উর্বরের সঙ্গে মাছের কি সম্পর্ক? ওই যে, এই লেখার শুরুতেই বলেছি মাছ হল উর্বরতার প্রতীক। নাগাল্যান্ডের

ধর্মারাসু শ্রী উল্লায়া মৎস্য উৎসব

খিলিনিয়ে হলো একই রকম উৎসব যেখানে চান্দ্রতিথি হিসাবে একুশতম দিনে কয়েকটি ধান জমিতে ফেলে এই উৎসবের সূচনা হয় বছরের প্রথম দিনে। সেদিন মাছ ধরার অনুষ্ঠান চললেও সেই মাছ সেদিন খাওয়া হয় না, সঞ্চয়ের প্রতীক হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। পরেরদিন সেই মাছ নতুন চাল দিয়ে খাওয়া হয়। মণিপুরের কাজরী মৎস্য উৎসব মারাম জনগোষ্ঠীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসবে ধরা মাছ তারা প্রাথমিকভাবে যারা মাছ ধরতে শারীরিকভাবে অক্ষম বা কোনোকারণে ধরতে পারেনি তাদের মধ্যে আগে ভাগ করে দেয়। তারপরে কিছুটা তারা খেয়ে বাকি মাছ তারা শুটকি হিসাবে জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে তাদের কাছে এই উৎসব এতোটাই পবিত্র যে তারা মনে করে কোন বছর এটা না হলে বড়ো কোনো দৈব বিপদ আসতে পারে। মণিপুরের সাংগাই কুকি গ্রামের খ্রিস্টান আদিবাসীরা আবার গুড ফ্রাইডে পালনের জন্য মাছ ধরার উৎসবের আয়োজন করে। আমাদের বাঙলায়, ঘরের কাছেই হুগলির আদিসপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুর গ্রামে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিনে এক মাছের মেলা বসে যা প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো। এই মেলার বিশেষত্ব হল এটি বৈষ্ণবদের মিলনস্থল। হ্যাঁ,শুনতে অদ্ভুদ লাগলেও এটা ঠিক। এর পিছনে একটা ছোট্ট ঐতিহাসিক কাহিনি আছে। প্রায় ৫০০ বছর আগে ওই অঞ্চলের জমিদারপুত্র রঘুনাথ দাস ছিলেন মহাপ্রভুর অন্ধ ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেন এবং ক্রমে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর ভক্তি পরীক্ষার জন্য একদিন কয়েকজন সাধক এসে তাঁর বাড়িতে এসে শীতকালে ইলিশ মাছ আর আম খেতে চান। ভক্ত রঘুনাথ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে পুকুর থেকে ইলিশ মাছ ধরান এবং তাঁর গাছ থেকে সুমিষ্ট আম পাড়িয়ে মাঘী পূর্ণিমার দিন সাধকদের খাওয়ান তাঁরা কৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন পূণ্যভূমিতে। তবে থেকেই ওই নির্দিষ্ট দিনে এই মেলার প্রচলন। এখনও প্রতি বছর এই মেলায় বিভিন্ন রকম বিশালাকৃতি মাছ পাওয়া যায়।

হুগলীর কৃষ্ণপুরে মাছের মেলা

পূর্ব থেকে এবার নজর দেওয়া যাক উত্তরের দিকে। উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল অঞ্চলের জনপুরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পালিত হয় মাণ্ড মৎস্য উৎসব। স্থানীয় এগ্রাল নদীতে বছরে ওই একটা দিনে সর্বসাধারণের জন্য মাছ ধরার আয়োজন করা হয়। মাছ ধরার একটু আগে স্থানীয় টিমরু নামের এক গাছের শিকড় ও ছালের গুড়ো ব্যবহার করা হয় মাছের চার হিসাবে যাতে একজায়গায় অনেক মাছ জড়ো হয়। তারপর ঢাকঢোল বাজিয়ে শুরু হয় মাছ ধরার উৎসব। এই উৎসব আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল বছরের বাকি দিনগুলো নদীর জলে যেন কেউ মাছ না ধরে তা নিশ্চিত করা।

এইসব স্বতস্ফূর্ত স্থানীয় মৎস্য উৎসব ছাড়াও বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মৎস্য উৎসব করা হচ্ছে বিভিন্ন মাছ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও আগ্রহ বাড়াতে। ২০১৯-২০ সালে সরকারি ভাবে সাতটি এইরকম ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয় যার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে, দুটি তামিলনাড়ুতে, দুটি তেলেঙ্গানায়, একটি ত্রিপুরায় এবং একটি হায়দ্রাবাদে। এইসব ফেস্টিভালে বিভিন্ন রঙিন মাছের প্রদর্শনী ও বিক্রি হয়, স্থানীয় মাছের চারা দেওয়া হয় উৎসাহী চাষীদের, বিভিন্ন মাছ ধরার উপায়ের প্রদর্শনী হয় আর সঙ্গে তো অবশ্যই থাকে মাছের রকমারী পদের রান্না। সরকারি হিসাবমতো এ বছর প্রায় দু লাখ মানুষ এতে অংশ নিয়েছিলেন। এর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন উপকুলবর্তী জায়গায় যেমন দীঘা, গোপালপুর, গোয়া, মুম্বাই বাৎসরিক সামুদ্রিক মাছের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন সামুদ্রিক ও লবণাক্ত জলের মাছের নানা পদ রান্না হয়। দেশ বিদেশের বহু মানুষ শুধু এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসেন।

এই তো গেল আমাদের দেশের বিভিন্ন গল্প। কিন্তু এই মাছ নিয়ে উৎসবের উন্মাদনা কিন্তু শুধুমাত্র এই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নেই,তা বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা জনজাতির ভাবনায় মিশে গিয়ে। নাইজিরিয়ার কেব্বি প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া বাৎসরিক আরগুনগু মৎস্য উৎসব হলো তার অন্যতম নিদর্শন। এই চারদিনের উৎসবের এক নির্দিষ্ট দিনে বন্দুকের শব্দে হাজার হাজার উৎসাহী মৎস্যশিকারী ঝাঁপিয়ে পড়েন মাতান-ফাড়া নদীতে। হাতে মাত্র একঘণ্টা সময়। এর মধ্যে যিনি ধরতে পারবেন সবথেকে বড়ো মাছটি তার কপালে জুটতো মিনিবাসের মতো বড়ো পুরস্কারও! আর একটা মজার মাছ ধরার উৎসব চলে বরফের লেকে! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন! ১৯৯১ সালে ব্রেইনার্ড জয়েস আমেরিকার গাল্ফ লেকের জমে যাওয়া জলে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আয়োজন করেন এক অভিনব বরফের জলে মাছ ধরা অনুষ্ঠানের যা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের সবথেকে বড়ো জমাট জলে মাছ ধরার উৎসব! সাধারণত জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসবে আজ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় কুড়ি হাজার উৎসাহী মৎস্যশিকারী অংশ নেন এবং ওই অঞ্চলের উন্নতিকল্পে গড়ে আড়াই লক্ষ ডলার স্থানীয় ব্যবসা ও

আমেরিকার জমাট বাঁধা গাল্ফলেকে মৎস্য উৎসব

ফল ফিশ ফেস্ট ম্যাসকট

চ্যারিটিতে দেন! তাহলেই ভেবে দেখুন এই জমাট বাঁধা উৎসবের পরিধি! আমেরিকার আরো দুটি জায়গায় আরো দুই রকমের, বা বলা ভালো পরিবেশ সংরক্ষণের দুই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে চলা দুটি মৎস্য উৎসবের কথা এই বিদেশী মৎস্যপ্রেমের আলোচনায় আসবেই। একটা হলো ক্যালিফোর্নিয়ার লেক তাহোয়ে এ 'ফল ফিশ ফেস্ট' এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় এনডেজারড লাহোলটান কাটথ্রোট ট্রাউট, কোকানি স্যামন ইত্যাদি মাছের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতের মাছেদের সবার সঙ্গে পরিচয় করানো এবং ওই অঞ্চলের ভাল্লুকের প্রজাতি রক্ষার ক্ষেত্রে ওইসব মাছেদের গুরুত্ব। এই উৎসবে অনেক পরিবার তাদের কচিকাঁচাদের নিয়ে আসেন এইসব জীববৈচিত্রের সঙ্গে শিশুমনের পরিচয় করাতে। এই উৎসবের ম্যাসকট হলো রঙচঙে কোকানি স্যামন। আর দ্বিতীয় উৎসবটি হলো ওয়াশিংটনের 'ইশাক স্যামন ডেজ ফেস্টিভাল'। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্যামন মাছেদের তাদের প্রজননের জলে ফিরে আসাকে উদ্‌যাপন করা। এই প্রবাহের বিভিন্ন জায়গায় স্যামন 'ওয়াচিং স্পট' আছে যেখান থেকে গাইডরা দর্শকদের দেখান কিভাবে চিনুক, কোহো, সকেই স্যামনদের তাদের ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাটে সানন্দে খেলে বেড়াচ্ছে।

ফলফিশ ফেস্ট ওয়াচিং পয়েন্ট

এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য প্রতিবছর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ আসেন এবং এই উৎসব ওই ছোট জনপদকে এতোটাই জনপ্রিয় করে তুলেছে যে স্থানীয় নেতারা মজা হয় ওই অঞ্চলকে 'ইশাক'-এর বদলে 'ফিশাক' বলেও ডাকেন। তবে সব মজা কি বড়োরাই নেবে? তাই কখনো হয়? না হওয়া উচিৎ?! সেই কথা মাথায় রেখেই ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যামথ লেকে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় খুদে মেছুড়েদের জন্য 'কিডস ফিশিং ফেস্টিভাল'। এখানে গাইডের মাধ্যমে আগামীর মেছুড়েদের শেখানো হয় কীভাবে ছিপ ফেলতে হয়, চার তৈরি

ক্যালিফোর্নিয়ার কিডসফিশিং ফেস্টিভাল

করতে হয়, টোপ দিতে হয় ইত্যাদি। আর পুরস্কার? একটা করে ট্রাউট মাছ! এইসব মাছধরার উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মাছ খাওয়ার উৎসব তো রয়েইছে। আমেরিকার 'মেইনে লবস্টার ফেস্টিভাল' যার প্রধান আকর্ষণ বিশালাকায় সামুদ্রিক চিংড়ি, অস্ট্রেলিয়ার 'নারুমা অয়েস্টার ফেস্টিভাল' যেখানে সার্ভ করা হয় অয়েস্টারের বিভিন্ন লোভনীয় রেসিপি, নিউজিল্যান্ডের 'অকল্যান্ড সীফুড ফেস্টিভাল' যার আকর্ষণ নানারকম সামুদ্রিক মাছের পদ, আয়ারল্যান্ডের 'গলওয়ে অয়েস্টার এন্ড সীফুড ফেস্টিভাল' যা প্রায় কুড়ি হাজার মানুষকে টেনে আনে দেশে বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ইংল্যান্ডের 'ডর্সেট সীফুড ফেস্টিভাল' যা সি.এন.এন এর ভোটে শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক মাছের উৎসব, এগুলো হলো বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত মৎস্য উৎসব। আর শুধুমাত্র খাওয়াই না, এইসব উৎসবে কিন্তু মাছেদের প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, মাছ ধরাকে নিয়ন্ত্রণ করা, মৎস্যশিকারীদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষিত করা এসবও চলে, এবং এর সবথেকে বড়ো উদাহরণ হলো ইটালীর জেনোয়ার 'স্লো ফিশ

নাইজেরিয়ার আরগুনগু উৎসব

ফেস্টিভাল', যেখানে চার দিনের উৎসবে বিভিন্ন বিতর্কসভা চলে যার উদ্দেশ্য হলো মাছেদের বাসস্থানের পরিবেশের উন্নতিসাধন।

তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে এই উৎসবের বিষয়ে দেশে-বিদেশে মাছও কিছু কম যায় না! আর যতোই লোকে মাছে ভাতে বাঙালি আমাদের বলুক না কেন, ভারতের ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশে মাছ নিয়ে উন্মাদনা আমাদের থেকে খুব কম কিছু নয়। কোনক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র স্থানীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরিবেশের ভালোবাসার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আবার কোনোক্ষেত্রে তা স্থানীয় ও দেশের অর্থনীতির সাথে সরাসরি সংযুক্ত। যেটাই হোক না কেন, মাছ আমরা ছাড়ছি না ছাড়বো না! আমাদের সবার উৎসব হয়ে উঠুক মৎস্য-মুখর, পরিবেশ-মুখর।

তথ্যকৃতজ্ঞতা

১) কৌশিক মজুমদার— 'নোলা'।
২) রামকুমার মুখোপাধ্যায়— 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'
৩) ইন্টারনেট।

চিত্র সূত্র

ইন্টারনেট।

।। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের রকমফের ।।

অভীক ঘোষ

কবি বলেছেন "দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর"। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বাস্তব জগতে দাঁড়িয়ে আমাদের হয়তো নগর সভ্যতা ছেড়ে অরণ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই উন্নত এবং সুস্থ জীবনের স্বার্থে আমরা চেষ্টা করতে পারি কিভাবে অরণ্যকে, প্রকৃতিকে নগরের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়। আর এই প্রকৃতি যদি জলজ প্রকৃতি হয় তাহলে তাকে স্থান দেওয়া যায় আমাদের চার দেওয়ালের মধ্যেও। আমাদের ইঁট-কাঠ-পাথরের শুকনো চৌহদ্দির মধ্যে যদি থাকে এক টুকরো ঘন সবুজে মোড়া জলাশয় আর তাতে খেলে বেড়ায় দেশী-বিদেশী রঙিন মাছেরা তাহলে তা আমাদের বাড়ির সাথে সাথে আমাদের মনের পরিস্থিতিরও সবুজায়ন ঘটাবে একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। এই ভাবনা থেকেই আমার নিজেরও প্ল্যান্টেড অ্যাকোয়ারিয়ামের হাতেখড়ি। তখন অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে বিশেষ কিছু ছিল না। একদিন আমার এক মামাতো ভাই, যার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে প্ল্যান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম নিয়ে, সে দেখে বলল আমার প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম নাকি আমি ডাচ শৈলী অনুসরণ করে করেছি। আমার অবাক হওয়ার পালা শুরু তখন থেকে। ডাচ শৈলী! সেটা আবার কি! তারপর শুরু করলাম পড়াশুনা আর আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে খুলতে লাগল প্ল্যান্টেড দুনিয়ার প্যান্ডোরার বাক্স। চলুন, তাহলে আমরা সবাই একটু ওই বাক্সের ঢাকনা সরিয়ে দেখি কি কি রকমফের আছে জলের সবুজ জগতে।

কথায় আছে, একটা ফাঁকা অ্যাকোয়ারিয়াম হল ফাঁকা ক্যানভাস এর মত। সেটাকে নিজের মনের মতো করে, নিজের শিল্প, চিন্তা ভাবনা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারলে আসে পরম মানসিক শান্তি। এখন আপনি চাইছেন গাছ, পাথর, কাঠ ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে একটা দৃষ্টিনন্দন অ্যাকোয়ারিয়াম, মানে প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরী করতে। গত 'মেছোবই' সংখ্যায় আমরা দেখেছি কিভাবে সহজেই প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম করা যায়। সেইসব পদ্ধতি অনুসরণ করে প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম তো নয় হল , এর সাথে সাথেই মাথায় চলে আসে কিভাবে সেটাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলা যায়। সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই অ্যাকোয়াস্কেপিং এর উৎপত্তি। প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়ামকে যেমন শুধু গাছ দিয়ে সাজানো যায়, তেমনই পাথর এর সাথে গাছ বা কাঠ এর সাথে গাছ কিম্বা পাথর কাঠ দিয়েও সাজানো যেতে পারে। তো এই এক বা একাধিক উপকরণ দিয়ে সাজানো অ্যাকোয়াস্কেপিংকে আমরা সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) ডাচ শৈলী,
২) ইওয়াগুমি শৈলী,
৩) বায়োটোপ শৈলী,
৪) জঙ্গল শৈলী,
৫) নেচার অ্যাকোয়াস্কেপিং শৈলী এবং ৬) ওয়ালস্ট্যাড পদ্ধতি।

এর মধ্যে অ্যাকোয়াস্কেপিং বিশ্বে সবথেকে জনপ্রিয় দুটি শৈলী হল নেচার অ্যাকোয়াস্কেপিং শৈলী এবং ডাচ অ্যাকোয়াস্কেপিং শৈলী। যদিও ইওয়াগুমি শৈলী ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

১) ডাচ শৈলী

ডাচ শৈলী হলো অ্যাকোয়াস্কেপিং জগতের প্রাচীনতম শৈলী। ১৯৩০ সালে

"ডাচ সোসাইটি অফ অ্যাকোয়ারিস্ট" হল এই শৈলীর উদ্ভাবক। নেদারল্যান্ডস এর রাস্তার ধারের গাছের অসাধারণ রঙ ও আকৃতির সাথে মিল রাখতেই বোধহয় এই শৈলীতে প্রাথমিকভাবে জোর দেওয়া হয় জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিন্যাসের উপর। গাছ ই হলো এই শৈলীর শো-স্টপার! পাথর, কাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন এখানে হয় না। একটা ডাচ-স্কেপ করতে গেলে যেটা অপরিহার্য সেটা হল জলজ উদ্ভিদের ঘনত্ব, বৈচিত্র্য এবং রঙের ভারসাম্য বজায় রাখা। আর ট্যাঙ্কের মোট অঞ্চলের ৭০ % অঞ্চল জলজ উদ্ভিদ দিয়ে ভর্তি করতেই হবে। দৃষ্টি নান্দনিকতার জন্য পিছনের দিকে সাধারণত লম্বা গাছ এবং সামনের দিকে ছোট গাছ, কার্পেটিং প্ল্যান্ট এসব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধির এবং একাধিক প্রজাতির জন্য স্টেম জাতীয় গাছ অ্যাকোয়ারিস্ট দের কাছে বেশ জনপ্রিয়। আর হ্যাঁ, এই স্কেপে কিন্তু কোনো এক প্রজাতির কমপক্ষে এক ডজন মাছের ঝাঁক রাখতেই হবে।

২) ইওয়াগুমি শৈলী

ইওয়াগুমি কে বর্তমানে অ্যাকোয়াস্কপিং জগতের "দ্যাখো আমি, বাড়ছি মাম্মি" বলাই যায়। এই স্কেপকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আধুনিক জগতের বিখ্যাত অ্যাকোয়াস্কেপার তাকাশি আমানোর অবদান অনস্বীকার্য। জাপানী ভাষায়"ইওয়াগুমি"র অর্থ হল পাথরের বিন্যাস। ফলে নাম থেকেই কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় যে ডাচ স্কেপে যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে গাছ তো এই ইওয়াগুমি শৈলীতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল পাথর। শুনতে শুধু পাথর মনে হলেও এটা কিন্তু খুব একটা সহজ শৈলী না তার কারণ গোল্ডেন রেশিও অনুসারে ওই পাথরগুলো সাজিয়ে অল্প গাছ দিয়ে গোটা স্কেপটাকে দৃষ্টি নন্দন

করে তুলতে হয়। আর আমাদের চোখ যেহেতু সব কিছু জোড়ায় দেখতে সাবলীল, তাই এই শৈলীতে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ছোঁয়া আনার জন্য পাথর রাখা হয় বিজোড় সংখ্যায়। এই স্কেপে পাথর, গাছ এবং ফাঁকা জায়গার মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা জরুরি। যেহেতু এই শৈলীতে পাথর প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাই অবস্থান ও সাইজ অনুযায়ী বিভিন্ন পাথরের আলাদা আলাদা নামকরণও করা হয়েছে।

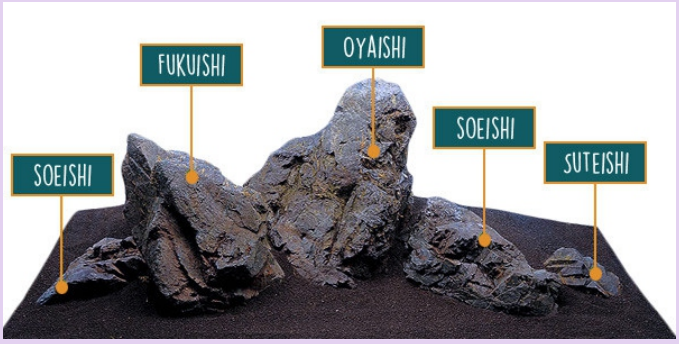

ক) ওয়েশি বা ইয়াশি - গোটা স্কেপের সবথেকে বড়ো ও সবথেকে ভালো টেক্সচারের পাথর হল ওয়েশি। স্বাভাবিকভাবেই এটা ট্যাঙ্কের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। আর এই পাথরকে আরো প্রাকৃতিক করে তোলার জন্য সাধারণত ট্যাঙ্কের জলের প্রবাহের দিকে কিছুটা হেলিয়ে রাখা হয়।

খ) ফুকুইশি - এই স্কেপে ওয়েশির পরের স্থান হলো ফুকুইশির, সেটা পাথরের আকৃতি ও প্রকৃতি, দুদিক থেকেই। ওয়েশির ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা ওয়েশির ঢালের বিপরীতমুখী করে ওয়েশির ডান বা বাম পাশে বসানো হয়।

গ) সোয়েশি - ওয়েশি ও ফুকুইশির সৌন্দর্য বাড়াতে এর আগমন। আকৃতিতে ছোট কিন্তু প্রকৃতিতে এক এই পাথর প্রধান দুই পাথরের আশেপাশে থেকে ওদের উপস্থিতিকে আরো জোরদার করে তোলে।

ঘ) সুতেশি - ইওয়াগুমি শৈলীর চতুর্থ পাথর সুতেশি কে the sacrificial stone ও বলা হয়ে থাকে। কারণ এই পাথরটিকেই একমাত্র জলজ উদ্ভিদ বা মস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় অনেক সময়। পাথুরে স্কেপের মধ্যে এই সুতেশির গায়েই থাকে সবুজের ছোঁয়া যা বাকী পাথরগুলোকে আরো বেশী লক্ষনীয় করে তোলে এবং সব মিলিয়ে একটা বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কেপ গড়ে তোলে। এই সুতেশি যেহেতু আকারে ছোট হয় তাই একে ঢাকতে কার্পেট প্ল্যান্ট বেশী ব্যবহার করা হয়।

৩) বায়োটোপ শৈলী

বায়োটোপ শৈলী বর্তমানে খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বায়োটোপ স্কেপ বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক জলজ ল্যান্ডস্কেপের যথাযথ প্রতিরূপ। সোজা কথায় আপনাকে একটা ছোট্ট জলাশয়ের নকল করতে হবে আপনার ট্যাঙ্কে, সেটা আমাজন রেইনফরেস্টের একটা ছোট অংশ বা কোনো হ্রদের তলদেশ বা আপনার বাড়ির আশেপাশের কোনো জমা জলাশয়ও হতে পারে। কিন্তু যেখানকারই হোক না কেন আপনাকে সেই অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা থেকে রসায়ন, সাবস্ট্রেট থেকে গাছ সমস্ত কিছু কিন্তু একদম সেখানকার মতোই রাখতে হবে আপনার ট্যাঙ্কে। আর বায়োটোপ শৈলীর আসল চ্যালেঞ্জটা এখানেই। একটা ভিন্ন অঞ্চলের জলের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে আপনার ট্যাঙ্কে রক্ষা করাটা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে এই স্কেপে সব জিনিসই প্রকৃতি থেকে জোগাড় করতে হয় বলে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গার জলাভূমির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয় বলে এই অ্যাকোয়াস্কেপিং এর কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়ম হয় না। আর এই স্কেপে জলজ উদ্ভিদ, কাঠ, পাথর, গাছের শুকনো পাতা এরম বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার হয়।

৪) জঙ্গল শৈলী

হ্যাঁ, নাম শুনে ঠিকই আন্দাজ করেছেন। জঙ্গল শৈলী বা স্কেপের উদ্দেশ্য হল একটা জঙ্গলের বিশৃঙ্খল, বন্য পরিবেশ তৈরি করা আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা ওই সুশৃঙ্খল ডাচ শৈলীর ঠিক বিপরীত একটা স্কেপ। আর জঙ্গল বলতেই প্রথমে যেটা মনে আসে সেটা হলো গাছ। তাই এই স্কেপে গাছের ভুমিকা মুখ্য। ছোটো পাতার গাছ থেকে বড়ো পাতা, ঝোপ থেকে কার্পেট সব ধরণের গাছ মিলিয়েই তৈরী হয় এই স্কেপ। সাথে স্বাভাবিকভাবেই যেটা চলে আসে সেটা হলো বিভিন্ন রকম কাঠের ব্যবহার। কাঠ এবং বিভিন্ন রকম গাছ অসংলগ্নভাবে সাজিয়ে গড়ে তোলা হয় সবুজ এই স্কেপ। এই অগোছালো ভাবটাই হলো এর প্রধান আকর্ষণ। আর ঠিকমতো করতে পারলে এই শৈলীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য হয় রীতিমতো চোখ ধাঁধানো। তবে এতো রকম গাছ ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগে অভিজ্ঞতা। আর সেটাই এই স্কেপের সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

৫) নেচার অ্যাকোয়ারিয়াম শৈলী

শৈলীর জনপ্রিয়তার নিরিখে যদি কেউ ডাচ শৈলীকে টক্কর দিতে পারে তাহলে সে নিঃসন্দেহে নেচার অ্যাকোয়ারিয়াম শৈলী। আর এই নেচার স্কেপের জনপ্রিয়তার কারণ হলো এটা শুধুমাত্র জলজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে থেমে থাকে না, বরং এই শৈলীতে বেশী ফুটে ওঠে স্থলজ প্রকৃতির দৃশ্য। ঠিকই পড়লেন, পাহাড় থেকে উপত্যকা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সবরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করা যায় এই শৈলীর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। পাথর, কাঠ, বিভিন্ন উদ্ভিদ, বালি ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহার ও গ্রুপিং করে ট্যাঙ্কে ফুটিয়ে তোলা হয় এক স্বপ্নের দেশ যেখানে হারিয়ে যেতে আপনার মন চাইবেই। বিন্যাস পদ্ধতি বিবেচনা করে এই নেচার অ্যাকোয়ারিয়াম শৈলীকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়-

ক) অবতল আকৃতির শৈলী- এই শৈলীতে ট্যাঙ্কের একটা নীচের দিকের জায়গাকে ফোকাল পয়েন্ট ধরে নেওয়া হয়। ওই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দুপাশের গাছপালা, পাথরদের এমনভাবে বসানো হয় যাতে দুপাশটা উঁচু ও ঘন হয়ে গিয়ে মাঝের নীচু অংশ ফাঁকা থাকে।

খ) উত্তল আকৃতির শৈলী- এই শৈলীর বিন্যাস আগের শৈলীর ঠিক বিপরীত। এক্ষেত্রে দুপাশে কিছুটা নিচু অঞ্চল রেখে মধ্যের অঞ্চল গাছ, পাথর ও কাঠ দিয়ে উঁচু করা হয়। তারপর সেখানের গাছগুলো ঠিকঠাক ছেঁটে একে অনেকটা কোনো দ্বীপের মতো আকৃতি দেওয়া হয়।

গ) ত্রিভুজ আকৃতির শৈলী- এই শৈলীর বৈশিষ্ট্য হলো ট্যাঙ্কের একপাশে গাছ, পাথর ও কাঠ দিয়ে উঁচু করা হয়। তারপর ক্রমশ তার উচ্চতা কমতে কমতে অন্য পাশে গিয়ে সেটা সাবস্ট্রেটে মিশে যায়। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে এই শৈলীকে সত্যিই একটা সমকৌণিক ত্রিভুজের মতো দেখতে লাগে।

৬) ওয়ালস্ট্যাড পদ্ধতি - ডায়না ওয়ালস্ট্যাড তাঁর Ecology of the Planted Aquarium বইটির মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আগে বর্ণিত পাঁচটি পদ্ধতির থেকে এটা একটু আলাদা এর অনন্য শৈলীর জন্য। এই পদ্ধতিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোনোরকম বাণিজ্যিক মাটি, কৃত্রিম কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এমনকি কোনও রকম ফিল্টারও এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণ মাটি এবং বালির সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে তাতে স্বাভাবিক ভাবে গাছ পোঁতা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বিয়োজনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মূল কথা হল আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র তৈরী করা। কোনো রকম কৃত্রিম জিনিস ব্যবহার না করার ফলে এই পদ্ধতি আমাদের পকেটের ওপর বেশী চাপ যেমন ফেলে না, তেমনই প্রাকৃতিক বৃদ্ধি, আলো এবং বিয়োজন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এই পদ্ধতিতে অ্যাকোয়ারিয়ামে ভারসাম্য আনাও বেশ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। তবে একবার সেই ভারসাম্য চলে এলে এই অ্যাকোয়ারিয়ামের বাসিন্দারা যে তাদের নিজেদের বাড়িতে থাকার অনুভূতি পায় তা বলাই বাহুল্য।

তাহলে আর দেরী না করে দ্রুত বেছে ফেলুন আপনার পছন্দের অ্যাকোয়াস্কেপিং শৈলী আর তৈরী করে ফেলুন আপনার চার দেওয়ালের মধ্যে এক টুকরো প্রকৃতিকে।

‘মেছোবই’ এর তৃতীয় পর্ব রয়েছে আপনার অপেক্ষায়।
মাছেদের নিয়ে আপনার ভালোবাসার গল্প ফুটিয়ে তুলুন
‘মেছোবই’ এর পরবর্তী সংখ্যায়।
সাথে যদি দিতে চান বিজ্ঞাপন তার জন্যও খোলা ‘মেছোবই’ এর পাতা।

কি-প্যাডে আঙুল চালান আর দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের অফিসিয়াল মেল আইডি-তে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন নীচের যেকোনো একটি নাম্বারে।
আমাদের অফিসিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস piratesden2017@gmail.com
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ৯৯০৩৫৬৯৯৩৫ ৯৩৩৩১৫০১৭৯

।। বিরল বোরালি কথা।।

শ্রয়ণ ভট্টাচার্য

বোরালির বাসস্থান

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখনই ছুটি কাটাতে উত্তরবঙ্গে যেতেন তখনই নিয়ম করে একটি পদ ওনার পাতে পরিবেশন করতেন রাঁধুনি কবীর হোসেন। কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে করা পাতলা ঝোলের এই পদটি বড়ো তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন জ্যোতিবাবু। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণববাবুও এই রান্নার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইচ্ছে হলেই যাতে খেতে পারেন তার জন্য পদটিকে রাষ্ট্রপতি ভবনের হেঁসেলে নিয়ে আসেন। পদটি হল বোরালি মাছের ঝোল। মূল চরিত্রে বোরালি মাছ, যাকে উত্তরবঙ্গের লোকেরা 'উত্তরের রুপোলি শস্য' বলে। কেউ আবার তার নাম দিয়েছে 'তিস্তার ইলিশ'। স্বাদে-আহ্লাদে-দেখতে বোরালির জুড়ি সত্যিই নেই। এককালে ব্যাগ ভর্তি করে বাড়ির কর্তারা এই মাছ নিয়ে আসত। রোজ খেয়ে খেয়ে বাড়ির গিন্নির মুখে অরুচি ধরে যেত। তবে এখন আর রাজাও নেই, রাজত্বও শেষের পথে। আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জনৈক একজন বলছেন, বোরালি মাছের দেখা পাওয়া আর টাইগার হিলে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া দুটোই এখন সমগোত্রীয়। ভাগ্যদেবতা সহায় না হলে দেখা মেলে না।

শ্রেণীতাত্ত্বিক অবস্থান:

সাইপ্রিনিডি (Cyprinidae) গোত্রের মাছ হল বোরালি। নানা জাতির নানা ভাষার লোকে একে বিভিন্ন নামে চেনে। বাংলায় বালি, খোকসা, চেদরা, ভাগড়া নামে পরিচিতি বেশি। এছাড়া অসমে কোরাঙ্গ (Korang) হিন্দিতে পারসি (Persee), নেপালে Faketa chahale, কর্ণাটকে Chalake নামে সুপ্রসিদ্ধ আমাদের বোরালি। সাধারণ ভাবে *Barilius barila* প্রজাতির মাছকে বোরালি হিসেবে ধরা হলেও এর আরো অনেক প্রজাতি আছে। তাই বলা যায় বোরালি কোন একক মাছ নয়, মাছেদের সংগঠন, সংগঠনে সদস্যদের মধ্যে *Barilius barna* (বানি খোকসা), *Barilius bendelisis* (হিরালু বোরালি), *Barilius ornatus, Barilius vagra* (ভাগড়া), *Barilius tileo, Barilius bonarensis* অন্যতম। IUCN (২০১৫) বোরালি মাছের ৫টি প্রজাতিকে Endangered বা বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অঙ্গসংস্থানগত পরিচয়:

দেহ লম্বা, চ্যাপ্টা রুপোলির ওপর সোনালি আভাযুক্ত ও মাথা সুচালো। তুণ্ড (snout) চ্যাপ্টা ও সুচালো, 'Pearl organ' এবং শুন্ডযুক্ত হতে পারে। পৃষ্ঠ পাখনাটি আকারে বড়, ৯-১৩ টি রশ্মিযুক্ত এবং পায়ু পাখনা ৯-১৭টি রশ্মিযুক্ত হয়ে থাকে। পুচ্ছ পাখনাটি দ্বি-বিভক্ত। এদের শরীরে পার্শ্বীয় রেখা (lateral line) থাকতেও পারে আবার নাও পারে। যদি উপস্থিত থাকে তবে রেখা বরাবর ৩৮-৯৪টি আঁশ দেখতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক বিন্যাস:

বোরালি প্রধানত স্বাদু জলের মাছ। পাহাড়ী নদীতেই এদের আধিপত্য বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের মধ্যেই এদের পাওয়া যায়। ভারত পাকিস্তান,

নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার হল এদের প্রকৃত আবাসস্থল। এছাড়াও থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, মিশর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে অল্প বিস্তর দেখা মেলে বোরালির। বোরালির প্রজাতিভিত্তিক ভৌগোলিক বিন্যাসের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল:

প্রজাতি	ভৌগোলিক বিন্যাস
১. *Barilius barila*	উত্তর ভারত, ওড়িশা,পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল
২. *Barilius barna*	গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, বাংলাদেশ, নেপাল
৩. *Barilius bendelisis*	নাগা পর্বত, নাগাল্যান্ড, বাংলাদেশ
৪. *Barilius ornatus*	মায়ানমার, থাইল্যান্ড
৫. *Barilius tileo*	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পাকিস্তানের সিন্ধু নদ, বাংলাদেশ
৬. *Barilius vagra*	উত্তর ভারত, গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান
৭. *Barilius bola*	বাংলাদেশ, মায়ানমার, উত্তর ভারত, ওড়িশা, পাকিস্তান

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের প্রায় সমস্ত নদীতেই বোরালি পাওয়া যায়। যদিও এদের প্রাচুর্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। প্রতি কেজি চারশো টাকা দরে এখন বাজারে আসে তাও যদি কোনবছর উৎপাদন ভালো হয় তবে।

বারোমাসে বিলুপ্ত বোরালি:

বারোমাসে বাঙালির পাতে বোরালির বিলুপ্তির কারণ হিসেবে প্রথমেই জলদূষণকে দায়ী করা হয়। চা বাগানে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক সহজেই নদীর জলে এসে মেশার ফলে জলের স্বাভাবিক চরিত্রের পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বোরালির প্রজনন ও আকারে বড়ো হওয়ার ক্ষমতা দুটোই ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খরস্রোতা নদীতে মাছ সংগ্রহের জন্য বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই জাল ব্যবহারে কম সময়ে অনেক পরিমাণ বিভিন্ন সাইজের বোরালি সংগ্রহ করা হচ্ছে। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Over exploitation। ফলস্বরূপ বারোমাস জুড়ে আর দেখা নেই বোরালির।

এছাড়াও রয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণ। নদীর বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য মাছেদের চলাচলে বাধা তৈরি হচ্ছে। তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। একে বলা হয় Habitat fragmentation। যার ফলে খাদ্যে সংকট এবং প্রজনন ঋতুতে সঙ্গীর অভাবে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে।

একটু আশার আলো:

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর কেন্দ্রে বোরালি মাছের Captive breeding বা কৃত্রিম প্রজনন চালু করা হয়েছে। এখানে চিকলি ও আত্রাই নদী থেকে বোরালি মাছের বিভিন্ন প্রজাতি প্রজননের জন্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর এদের প্রজনন ঋতু বর্ষাকালে (জুন-জুলাই) কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কম সময়েই অধিক পরিমাণে বোরালি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। যাতে বাজারের চাহিদার জোগান দেওয়া যায় এবং মাছের দামেও লাগাম আসে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, WOVA-FH নামক এক সিন্থেটিক হরমোনের প্রয়োগে এদের প্রজনন হার (fecundity rate) বৃদ্ধি। পায়। এই হরমোন প্রয়োগে মাছের Gonado-somatic index উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ফিসারী থেকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে মৎস্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কুচবিহারে দুইদিন ব্যাপী মৎস্য উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। যেখানে বিভিন্ন মাছের প্রদর্শনী ও তাদের বিভিন্ন পদ পরিবেশন করা হয়। সেই উৎসবের প্রথমদিনের নামকরণ করা হয়েছিল 'বোরালি উৎসব'।

সুতরাং কেবল সংরক্ষণ নয়, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিই একমাত্র হাতিয়ার বাঙালির জীবনে মাছের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখার জন্য। যাতে বাঙালি আগামীতেও 'মাছে ভাতে বাঙালি'ই থাকতে পারে।

ছবি -পবিত্র পাল

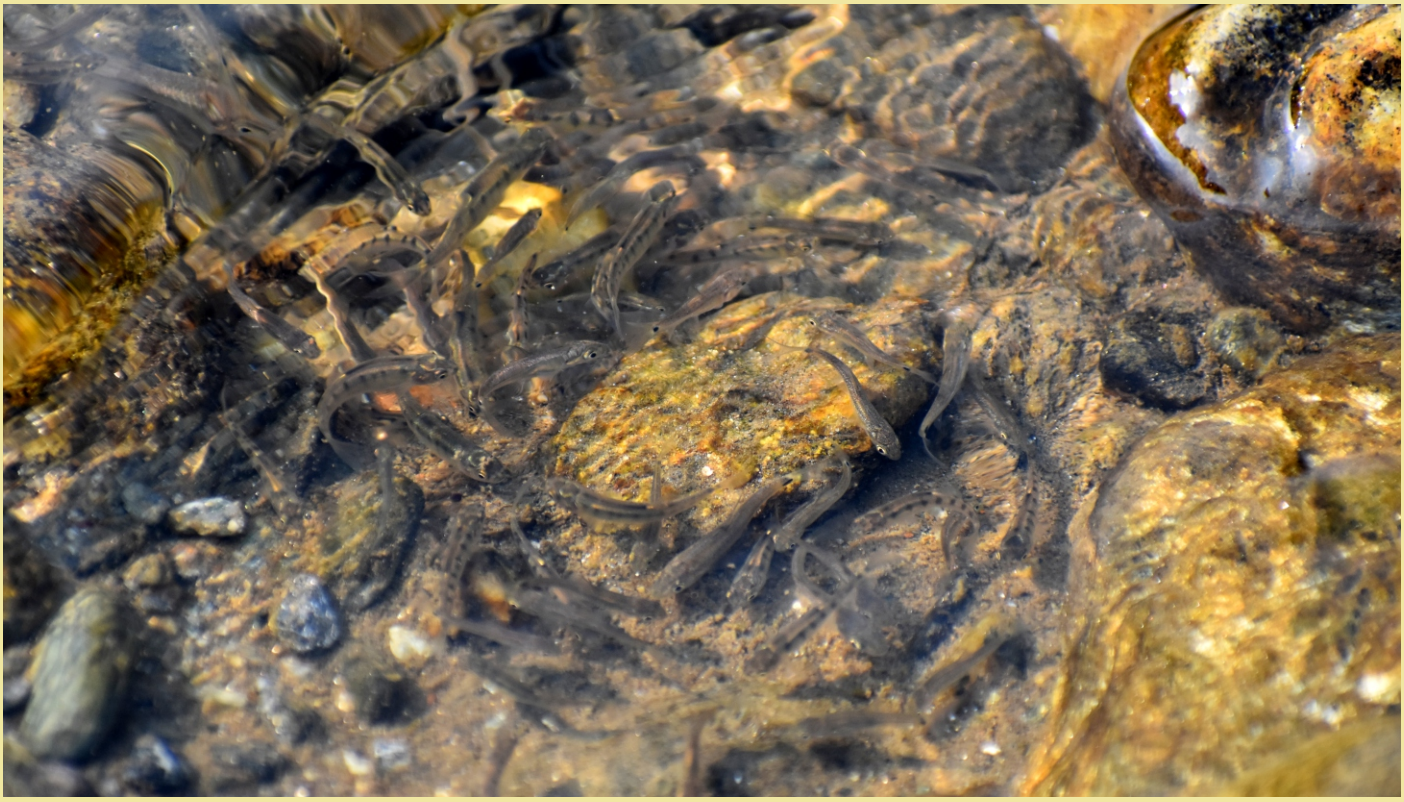

প্রকৃতিতে বোরালিরা

।। আগামীর মেছো।।

'আগামীর মেছো'-য় আমরা তুলে ধরেছি আমাদের বাড়ির সারল্যমাখা ক্ষুদেদের মাছ এবং জলজ প্রকৃতিকে দেখার নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গীকে। আর ঠিক ততোটাই নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের সবার 'মেছোবই'-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন এমন কয়েকজন যাঁদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের বড়ো হওয়ার পথে যখন আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা এসেছে, সেই সময় দ্বিধাহীনভাবে তাঁরা এসে আমাদের হাত ধরেছেন। তাই আমরা তাঁদের অমূল্য অবদানের মর্যাদা রাখতেই এই ছোটদের পাতা 'আগামীর মেছো'-কে উৎসর্গ করছি তাঁদের নামে।

তাঁরা হলেন—

তথাগত দত্ত, প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, সৌম্যদীপ বোস, সপ্তর্ষি চক্রবর্তী, অর্পিতা চক্রবর্তী

কৃশাঙ্গ পাল। ৫ বছর। সল্টলেক স্কুল। ক্লাস Pp2

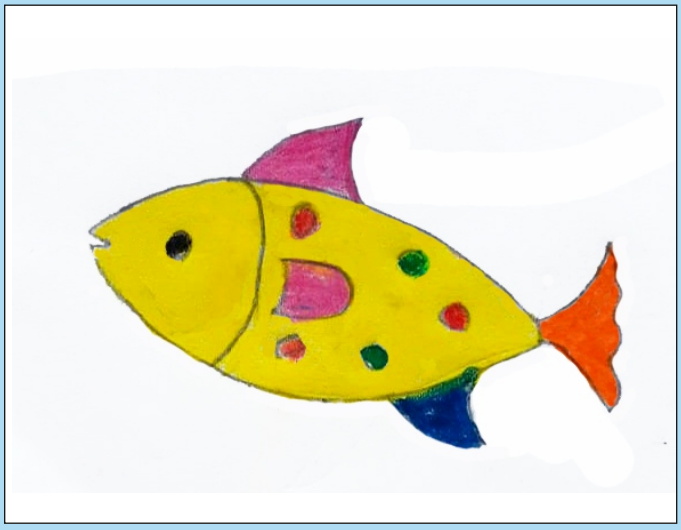

পর্ণা পাল। ৪ বছর। মাদার টেরিজা একাডেমি। ক্লাস লোয়ার নার্সারী

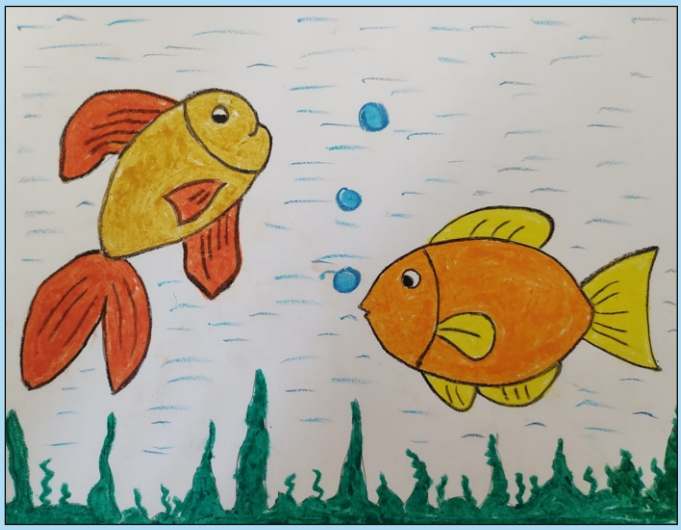

শ্রেয়ান দত্ত। ৫ বছর। বিবেকানন্দ উইসডম মিশন স্কুল। ক্লাস আপার নার্সারী।

দেবাংশী চক্রবর্তী। ৯ বছর। সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্সটিটিউশন। ক্লাস ৪

শ্রীনিকা মুখার্জী। ৫ বছর। লরেটো কনভেন্ট, আসানসোল। ক্লাস কে.জি।

অঞ্জিষ্ণু সরকার। ৫ বছর। সাউথ পয়েন্ট স্কুল। ক্লাস ট্রানজিশন।

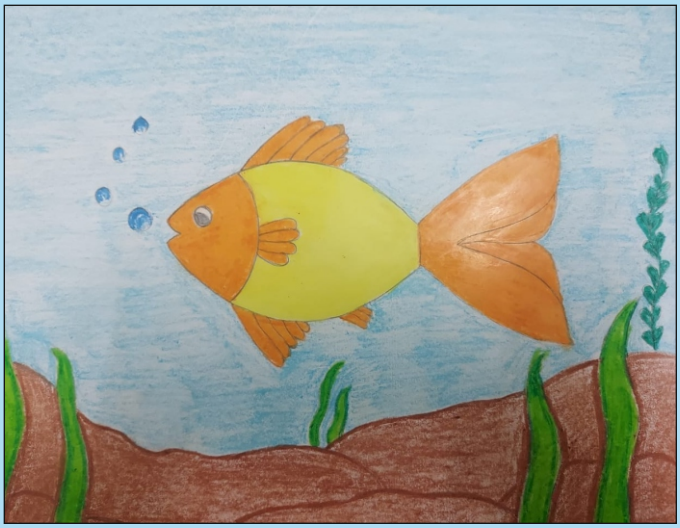

অনুষ্কা পাত্র। অনন্তপুর বাণীনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়। ক্লাস ৬

ঋতুজা সিংহ দেব। ভগবতী শিশু শিক্ষায়তন। ক্লাস কে.জি ১

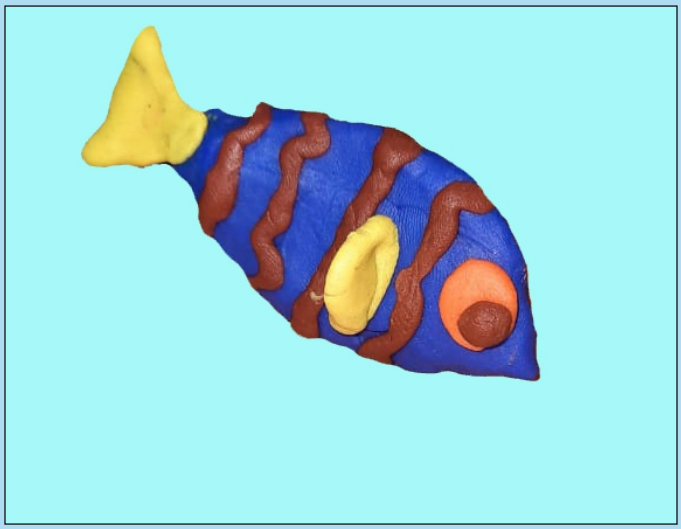

স্বচ্ছতোয়া বর। ৬ বছর। অক্সিলিয়াম কনভেন্ট। ক্লাস ১

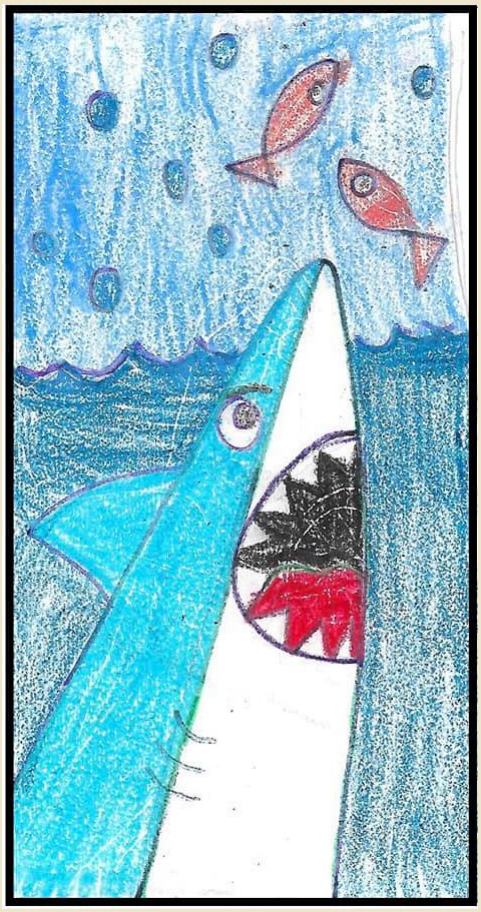

সৃজনী চক্রবর্তী। ৫ বছর। সল্টলেক স্কুল। ক্লাস আপার কে.জি।

মৎস্য

দেবাংশী চক্রবর্তী। ৯ বছর।
সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্সটিটিউশন। ক্লাস ৪

ঝিলের শিথিল জল,
হঠাৎ করে ছল-ছল,
উঠিল কেমনে ঢেউ!
নিশ্চুপ ভাবে, দাঁড়িয়ে দেখেছো কি কেউ?
জলে খেলা করে,
উথালি-পাথালি করে,
বলে আয় যাই বহুদূর, যাই চল,
মৎস্য ও মৎস্য রানির দল।
নেই বাধা, নেই বিঘ্ন,
নেই কোনো ভয়,
জলের ভিতর থেকে তারা ভাবে,
মানুষ না জানি কতো অসহায়!

Excellency in perseverance........
DRIPPING EARTH
Its all about hardscape
7602658768
Rocks
Gravel
Wood
Tissue
Culture
Plants
DRIPPING EARTH
Tropica
Additives
Fertilizer
Soil
ADA
aqua design amano
Fertilizer
Additives
Soil
RGB VIVID
Eheim
Chihiros
GREENOCULUM
VITAL MINERALS
PHYTOSTIMULANT
AquaSphere
Creating Nature
Aquasphere......
100ML
250ML
1L
2L
AquaSphere
Creating Nature
7602658768
Scape hard
Products
Nature Aquascaping
Meterials
Hardscape
Maintenance
Vlogs
Tutorial
Additives
Sanjay
+917602658768
www.facebook.com/DrippingEarth
DRIPPING EARTH

।।পার্কুলা ক্লাউন ফিশ।।

শুভদীপ দাস

দৃশ্য এক-জলের তলার ক্যামেরা, ঊর্ধ্বমুখী লেন্সে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের নীল জল, জলতলে খেলা করে বেড়াচ্ছে নরম সূর্যকিরণ, আর সেই আলো-আঁধারী নীলচে জলে অ্যানিমোনের মধ্যে দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে উজ্জ্বল কমলা সাদা কালো ডোরাকাটা একঝাঁক মাছ। ওই কালচে নীলাভ পরিবেশে তাদের গা থেকে যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে কমলা আভা।

দৃশ্য দুই-একবিংশ শতাব্দী তখন সবে কথা বলতে শেখার মতো বড়ো হয়েছে, ঘরে ঘরে মোটামুটি আসতে শুরু করেছে কেবিল কানেকশন। সেই সময় ডিসনি নিয়ে এলো এমন এক অ্যানিমেশন সিনেমা যা পরবর্তীকালে ডিজনির জনপ্রিয়তার সংজ্ঞাটাই বদলে দিল— **'Finding Nemo'**। কমলা সাদা কালো ডোরাকাটা বড়ো বড়ো চোখের এক মাছের মায়ায় এমন মজলো গোটা দুনিয়া যে বাচ্ছাদের সফট টয় থেকে মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশের বিশ্ব বাজার, দুটোতেই তরতর করে সামনে চলে এলো একটাই নাম, নিমো বা ক্লাউন ফিশ!

মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম মানে আপনি আপনার ঘরের একটা কাঁচের বাক্সে বন্দি করতে চাইছেন এক টুকরো খাল-বিল-নদী-নালা নয়, একেবারে সমুদ্রকে! আর এই ঘরের সামুদ্রিক সঙ্গী হিসাবে আপনি নিশ্চই চাইবেন না কোন এক করাল দাঁতওয়ালা ভয়াবহ 'Jaws' কে, বরং চাইবেন আপনার দিনের শেষে আপনার সঙ্গে খেলুক এক ছোট্টখাট্টো মিষ্টি 'Nemo' বা 'Merlin'। আর শুধু আমি বা আপনি কেন, গোটা বিশ্বের সামুদ্রিক মাছপুষিয়েদের যদি বলা হয় যে তাদের অন্যতম প্রিয় মাছের লিস্টি বানাতে, তাহলে তার খুব ওপরের দিকেই থাকবে ক্লাউনফিশের নাম। এক্ষেত্রে আমাদের একটা নস্ট্যালজিক বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয় হিন্দি ট্যাগলাইন একটু পুনর্নির্মাণ করে বলাই যায়, 'যো মেরিন সে করে পেয়ার, ও ক্লাউন ফিশ সে ক্যায়সে করে ইনকার?'

এহেন জনপ্রিয় ক্লাউনফিশ সম্পর্কে বিশদে আলোচনায় যাওয়ার আগে বরং একটু দেখেনি এর বিভিন্ন রকমফের। মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামের জগতে ক্লাউনফিশের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয়, চাহিদাযুক্ত এবং একই সঙ্গে আমাদের এই আলোচনার নায়ক হলো পার্কুলা ক্লাউন বা *Amphiprion percula*. এদের জনপ্রিয়তার একটা কারণ যদি এর মিশুকে স্বভাব হয় তো আরো বড়ো কারণ হলো এর রূপ! হ্যাঁ, এনাকে দেখতে অনেকটা ওই নিমোর মতোই-উজ্জ্বল কমলা আর তার উপর সাদা রঙের ডোরাকাটা দাগ যার বর্ডার আবার কালো রঙের। এদের নিয়ে আলোচনা বেশ জমিয়ে শুরু করার আগে দুটো মজার কথা জানিয়ে দিই বরং! একটা হলো এই পার্কুলা ক্লাউনের আবার একটা যমজ ভাইও আছে, ফলস পার্কুলা বা *Amphiprion ocellaris*, যার আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা এর মতোই কিন্তু তফাৎ হলো এর গায়ের সাদা দাগের ওপর কালো বর্ডারগুলোয়, যা পার্কুলা ক্লাউনের থেকে সরু। আর দ্বিতীয় কথাটা হলো জন্মগতভাবে কিন্তু সব ক্লাউনফিশই মেল! হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। তাহলে এদের বংশবিস্তার হয় কিভাবে?! আত্মত্যাগ মশাই, আত্মত্যাগ। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাউনফিশের দলের প্রধান ডমিনেন্ট মেল তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফিমেল হয়ে যায়। আর আপনি যদি সেই ফিমেলটিকে সরিয়েও নেন, কুছ পরোয়া নেই, দ্বিতীয় ডমিনেন্ট মেলটি তখন এগিয়ে আসবে তার পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে ফিমেল হতে। এভাবেই চলতে থাকে ক্লাউনফিশদের বংশবিস্তার।

পার্কুলা ক্লাউনফিশ মোটামুটি লম্বায় চার ইঞ্চি মতো বাড়তে পারে। তাই ছোট থেকে বড়ো যে কোনোরকম বিগিনার্স ট্যাঙ্কেরই এরা প্রথম পছন্দ হতেই পারে। ট্যাঙ্কমেট হিসাবে এরা যেকোনো অন্যান্য শান্ত মাছের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। বরং এদের অসুবিধা হয় অন্য প্রজাতির তুলনায় বড়ো ও ঝগড়াটে ক্লাউনফিশ যেমন মেরুন ক্লাউনফিশ, টমেটো ক্লাউনফিশ এদের সাথে থাকতে।

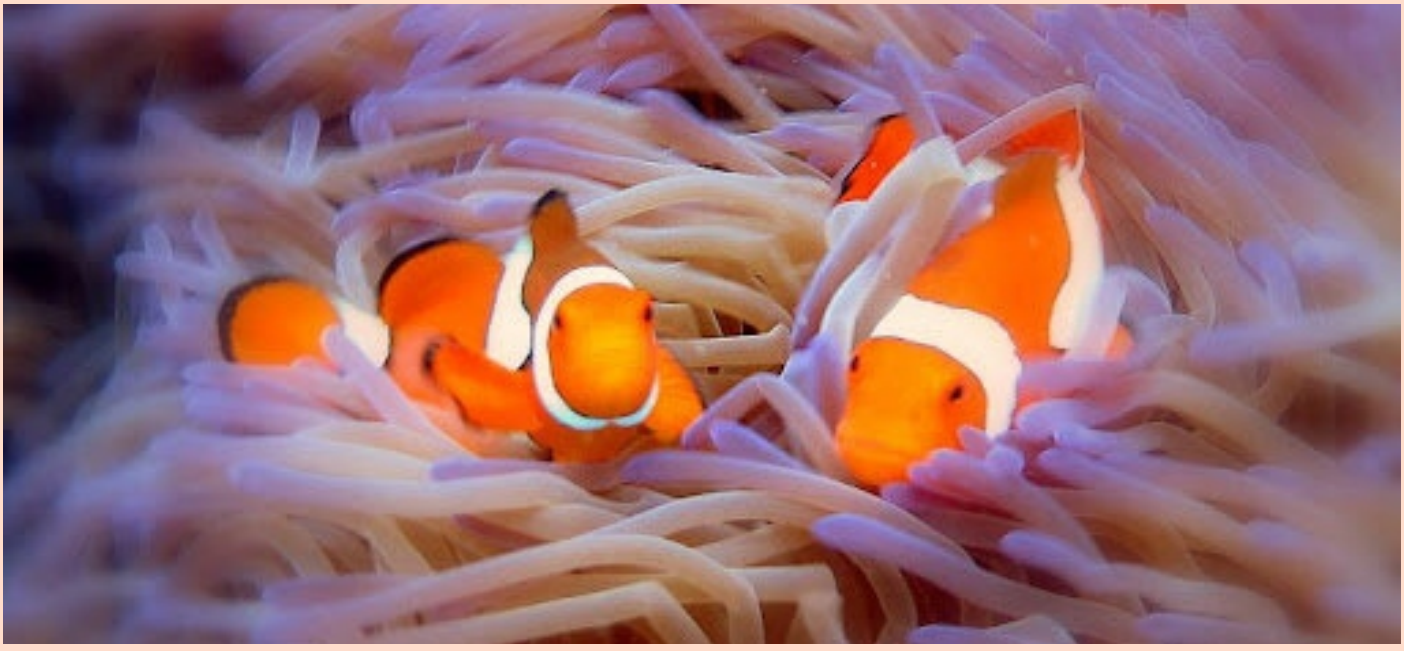

অ্যানিমোনের মাঝে পার্কুলা ক্লাউনফিশ

গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ

তাই বিভিন্ন প্রজাতির ক্লাউনফিশকে একসঙ্গে না রাখাই ভালো। এবার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি বলি তাহলে আমিও সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মেরিন ফিশকিপারদের মধ্যেই পড়ি যারা একটা তিনফুট ট্যাঙ্কে কিছু পার্কুলা ক্লাউন আর তার সাথে অ্যাজিউর ড্যামসেল (Azure damsel) দিয়ে মেরিন শুরু করেছিল। তারপর প্রায় একদশক কেটে গেছে, কিন্তু আমার নোনতা প্রেম বেড়েছে বই কমেনি। যাক, আবার ক্লাউনের কথাতেই ফিরে আসি। যতক্ষণ না এরা তুলনায় বড়ো মাছেদের দ্বারা আক্রান্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এরা কিন্তু সহজেই বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, ক্লাউনফিশ সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে এরা নাকি অ্যানিমোন (Anemone) ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে এরা অ্যানিমোন এর ওপর অতোটাও নির্ভরশীল নয়। আমার ট্যাঙ্কেই আমি দেখতাম এরা দিব্যি রাত্তিরে কোনো পাথর বা পাওয়ার হেড ফিল্টারের ওপর গিয়ে ঘুম লাগাতো। হয়তো ওইগুলোই ওদের অ্যানিমোন এর একটা মিথ্যা নিরাপত্তা দিতো।

খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে এদের বাছবিচার খুব একটা নেই। প্যালেট খেকে ফ্লেক, সবই চাঁদমুখ করে উদরস্থ করতে এরা সিদ্ধহস্ত। তবে এরা এই 'পেলেই খাই' ধারণায় বিশ্বাসী বলেই কিন্তু এদের জন্য ব্যালান্সড ডায়েটটা বেশি প্রয়োজন। জলের বেশি ফ্লো এদের খুব একটা পছন্দের নয়। ট্যাঙ্কে হাই ফ্লো তাই না দেওয়াই ভালো, আর দিলেও এরা এমন খাঁজ বা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয় যেখানে ফ্লো এর পরিমাণ তুলনায় কম। সব মিলিয়ে এই পার্কুলা ক্লাউন কিন্তু মেরিন ট্যাঙ্কের বিগিনারদের কাছে একদম আদর্শ মাছ যে একাধারে প্রাথমিক ট্যাঙ্কের সাইক্লিং প্রসেসের সঙ্গে মানিয়েও নিতে পারে আবার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপে-গুণে মুগ্ধ করতে পারে মালিককে। আর একটু মানিয়ে গেলে কিন্তু এরা বেশ রেসপন্সিভও। তবে একাধিক ক্লাউনফিশ কেনার সময় একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে যে তারা যেন সবাই সমান সাইজের না হয়, তাহলে এদের মধ্যে একটু ধাক্কাধাক্কি করার স্বভাবটা জেগে ওঠে।

বর্তমানে মেরিন ফিশের বাজার ছেয়ে গেছে ট্যাঙ্ক-ব্রিড ক্লাউনফিশে। এর একটা ধনাত্মক দিক হলো যে 'Finding Nemo' র পর থেকে মেরিন ফিশের বাজারে ক্লাউন ফিশের বিপুল পরিমাণ চাহিদাকে এটা মেটাতে পারছে প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্লাউনফিশদের খুব একটা বিরক্ত না করেই। ফলে তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বাসস্থানগুলো বেঁচে যাচ্ছে। আর এই ট্যাঙ্ক ব্রিড ক্লাউনফিশ প্রাকৃতিক ক্লাউনফিশের তুলনায় একটু ফ্যাকাশে, অনুজ্জ্বল হলেও এরা সেই খামতি পুষিয়ে দেয় ট্যাঙ্কে তাদের বেশি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে। তাহলে আর কি, একটা মোটামুটি আড়াই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া আর এক ফুট উঁচু ট্যাঙ্ক নিয়ে আসুন আর মিটিয়ে নিন নীলচে জলে রুপোলি পর্দার নিমোকে আপনার বসার ঘরে রাখার শখ।

ছবি –ইন্টারনেট

পার্কুলা ক্লাউনফিশের ভ্রূণের বিকাশ

।। এক ক্ষুদে রাক্ষুসে মাছের কাহিনি।।

তথ্যপ্রিয় দাস

দাঁত নিয়ে পড়াশুনা করেছি, কিন্তু হবি মাছ পোষা। তাই দাঁতাল মাছেদের দিকে আমার আকর্ষণ নেহাত কম না। হোস্টেলে থেকে পিরানহা, গার পুষে ফেলেছি, আবার দাঁত নেই, রেড টেল ক্যাট ফিশ এর মতো ফোকলা মাছও পুষেছি। অনেক দিন মাছ পোষার ফলে বুঝেছি যে, এমন কোনো মাছ পোষা উচিত না, যা আমার পক্ষে পরবর্তীকালে রাখা সম্ভব হবে না। যেমন গার মাছ। এমনিতে মাছ-টা খারাপ না, শান্ত, চুপচাপ, ভদ্র। কিন্তু ওই সাইজ-টাই যা একটু বড়ো। কিছু দিন রাখার পরে আর অ্যাকোয়ারিয়ামে ধরে না।

তাই আমি এমন একটা মাছ খুঁজছিলাম যা সাইজ-এ ছোট হবে, কিন্তু আচার-আচরণ পিরানহা-এর মতো হবে। সেই সময় এক জন পরিচিত ব্যক্তি আমায় একসোডোন টেট্রা নেবো কিনা জিজ্ঞেস করলে আমি নেট এ ডিটেলস-টা দেখে তাকে নয় পিস দিতে বলি। এদিকে আমার আবার মিকলজির বায়োটোপ, ওয়াইল্ড অ্যাকোয়ারিয়াম এইসব দেখে ন্যাচরাল হ্যাবিটেটে মাছ পোষার ইচ্ছা অনেক দিনের। তিন ফুট এর অ্যাকোয়ারিয়াম একটা খালি ছিল। কনস্ট্রাকশানের বালিও বাড়িতে এক বস্তা পড়েছিল। কিন্তু গাছের শিকড় কোথাও খুঁজে পাছিলাম না। অবশেষে পিসির বাড়ি কিছু তেজ পাতা গাছ কাটা হয়েছিল, তার কিছু শিকড় জ্বালানির জন্য রাখা আছে খবর পেলাম। সেই শিকড় আনতে বউ কে নিয়ে পিসির বাড়ি ছুটলাম। সঙ্গে হ্যাক-শ ব্লেড, ছেনি আর ছোট হাতুড়িও নিলাম। পিসির বাড়ি দুপুরে ভাত খেয়ে, পছন্দের দুই পিস শিকড় কেটে সাইজ করে বাস স্ট্যান্ড এ এসে শুনলাম বাস বন্ধ। অটো ভাড়া করে সেই ঢাউস শিকড় ভরা ব্যাগ নিয়ে বনগাঁ পৌঁছালাম। দেখে অনেকে হয়তো জ্যোতিষী ভেবে থাকবে। তারপর ওখান থেকে সন্ধ্যার বাস ধরে বাড়ি পৌঁছালাম।

পরদিন পুরোনো টুথব্রাশ নিয়ে পরিষ্কার করতে লেগে পড়লাম। ভালো করে ধুয়ে জলে ডুবিয়ে রাখলাম। মাসখানেক ডুবিয়ে রাখার পরও দেখলাম ভালো করে ডুবছে না। এক দিকে হেলে থাকছে। গ্রুপ-এর এক দাদা পরামর্শ দিলেন, হোয়াইট সিমেন্ট এর বেস দিতে। তো আমি ওই শিকড়ের নিচের দিকে কয়েকটা ছোট পেরেক মেরে তার ওপর খানিকটা হোয়াইট সিমেন্ট লাগিয়ে দিলাম। তার ওপর খানিকটা কনস্ট্রাকশন স্যান্ড ছড়িয়ে দিলাম। দেখে মনে হবে বালি লেগে আছে। এর পর ট্যাঙ্কের বেসে দেড় সেন্টিমিটার বালি দিলাম। তার ওপর শিকড়গুলো সাজিয়ে রাখলাম। পাম, শুকনো কাঁঠাল পাতা, বাঁশ পাতা, কাঠবাদাম পাতা এগুলো ভেজানো ছিলো। সেগুলো সাজালাম। আর কিছু সরু ডালপালা, পড, শুকনো ফল এক জনের থেকে ব্ল্যাক ওয়াটার এর জন্য কিনেছিলাম সেগুলো দিয়ে সাজালাম। আলোর জন্য দুই ফুটের একটা টিউব লাইট দিলাম।

এরপর গ্যালিফ গেলাম মাছগুলো আনতে। অনেক দামী মাছি, বলতে গেলে একরকম স্বপ্নের মাছ। টোটাল নয় পিস মাছ নিয়ে পকেট খালি করে বাড়ি চলে এলাম। ট্যাঙ্কে এ তিনটে ফিডার মলি ছাড়া ছিলো, ওয়াটার কন্ডিশানটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্য। বাকটুথ টেট্রা গুলো ছেড়ে দিলাম অ্যাকোয়ারিয়াম ঝাঁক বেঁধে ঘোরে মাছগুলো। সবরকম খাবারই খায় মাছগুলো। টেট্রাবিটসের দানা থেকে কেঁচো, কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। তিন দিন হয়ে গেলো। আমি তো মহা আনন্দে আছি। এই ফাঁকে বরং এদের বিষয়ে অল্প দু-চার কথা বলে নিই। বাক টুথ টেট্রা বা একসোডেন টেট্রা আমাজন বেসিন ও গুয়ানাতে পাওয়া যায়। যেসব জায়গায় নদীর অগভীর জলে, বালির ওপর সভানা তৃণভূমি এর মতো ঘাসের জমি তৈরি হয়, সেইসব জায়গায় এদের বেশি পাওয়া যায়। এরা নদীতে সাধারণত ছোট পোকা ও অন্যান্য মাছের আঁশ খুবলে খেয়ে থাকে। তাই এদের সঙ্গে কোনো আঁশওয়ালা মাছ রাখলেই এরা খুবলে খায়।

নদীতে এরা ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে, তবে অ্যাকুয়ারিয়াম এ চার ইঞ্চি মতো হয়ে থাকে। জলের পি.এইচ 5.5-7.5, এবং উষ্ণতা 72°F থেকে 82°F এর মধ্যে ভালো থাকে। এদের মধ্যে ক্যানিবালিসম দেখা যায়। তাই যত বড়ো ঝাঁক, তত নিরাপদ। ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। ততোদিনে দেখলাম ফিডার মলিগুলো ওনাদের পেটে চালান হয়ে গিয়েছে। আরো বড়ো ব্যাপার হলো একটা বাকটুথ খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক খুঁজে তার কঙ্কাল এর কিছুটা দেখতে পেলাম। আমি ভাবলাম হয়তো অসুস্থ হয়েছিল, তাই হয়তো মেরে খেয়েছে।

পরদিন ছুটি ছিল। সকাল থেকে ভালো করে ওদের ওপর নজর রাখলাম। দেখলাম ১ টা বাকটুথ একটু বড়ো সাইজ এর, আর ওইটা সবাই কে খুঁচিয়ে বেড়াছে। আমি ওই বড়ো-টাকে তুলে অন্য অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে দিলাম। বিকেল বেলা আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বাকিগুলোর মধ্যে অন্য একটা ওটার মতো ডমিনেন্ট হয়ে উঠেছে। ওটাকেও ধরে আগের বড়ো-টার সঙ্গে ডিভাইডার দিয়ে রেখে দিলাম। পর দিন সকালে আরো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো। চা খেয়ে এসে দেখি দুটো কে ধরে বাকিগুলো ব্রেকফাস্ট সারছে, অর্ধেক খাওয়া হয়ে গিয়েছে। দরকারি কাজ থাকায় তখন আর কিছু করতে পারিনি। রাতে ফিরে দেখি আরো একজন কমে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি সব কটাকে ধরে বালতি তে রাখলাম। এই খানে একটা ভুল করে বসলাম। অ্যাকোয়ারিয়াম এর পুরোনো জল না দিয়ে নতুন জলে মাছগুলোকে ছাড়াতে দুটো অসুস্থ হয়ে মরে গেলো।

তারপর থেকে ওই ডিভাইডার দেওয়া ছোটো জায়গায় আলাদা আলাদা থাকে সবাই। দেড় বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সাইজ তিন ইঞ্চি করে হয়ে গিয়েছে সবার। হাম্পি হেড খাবারের দানা, একটু ছোটো করে খেতে দি দিনে দুবার করে।

মাছগুলো ঠিক আছে, কিন্তু ওই এক ঝাঁক বাকটুথ রাখার ইচ্ছা টা আর পূরণ হলো না।

পরে একজন এর কাছে শুনে ছিলাম এগুলো মিনিমাম পঁচিশটা মতো রাখতে হবে আর ট্যাঙ্ক ছয় ফুট লাগবে। এখন এতো ইনভেস্ট করাও সম্ভব না, আর অতো বড়ো ট্যাঙ্কও নেই আমার। তাই ওই স্বপ্ন আর পূরণ হবার নয়। তবে একবার রেখেই আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অনেকটা পূরণ হয়েছে।

ছবি - লেখক।

ADVENTURE AQUATICS

WE DEALS IN ALL TYPES OF AQUARIUM FISH & ACCESSORIES

Hikari

AQUATIC REMEDIES™

PET FOODIES

Seachem®

BUBBLES & TROUBLES
YOUR AQUA SPECIALIST

AUSTRALIAN BLACK WORMS

OF® OCEAN FREE

Tropical®

Tetra

OCEAN NUTRITION®
Preserving Life and Beauty through Nutrition

FireGlow

9007971004

dasmaina826@gmail.com

P/ 18 Domestic Area
Dakshineswar. 700035

।। বিপন্ন মাদাগাস্কার ।।

সঞ্জীব পাত্র

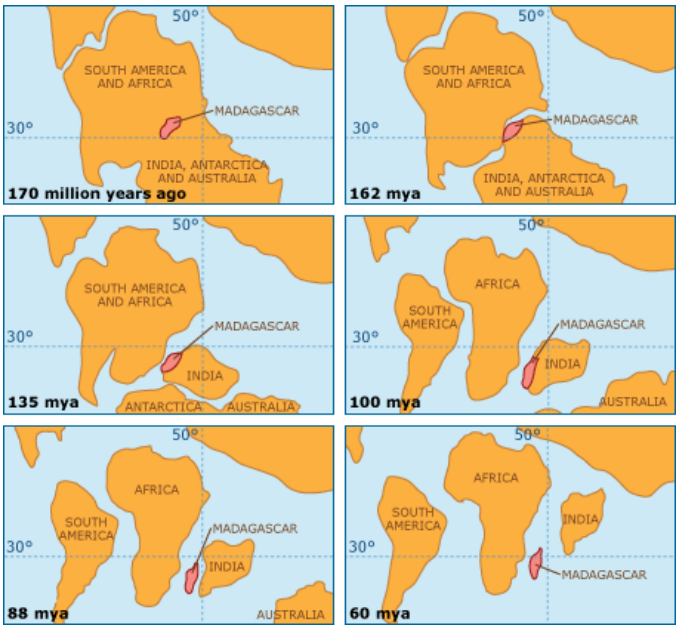

সময়ের সাথে সাথে আফ্রিকার মূল ভূখন্ড থেকে মাদাগাস্কারের বিচ্ছেদ

এই ২০২১ সালে আমি-আপনি যে পৃথিবীর ধুলো মাটিতে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি সেটা কিন্তু একদিনে মোটেই তৈরি হয়নি। কয়েক কোটি বছর ধরে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের, বড়সড় পরিবর্তনের মাধ্যমে সে এসেছে আজকের চেহারায়। ইতিহাসের পাতায় ধরা আছে পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ। যেমন আইস এজ-এ বরফের প্রাচুর্য, তারপরে সমুদ্রের জলতলের হ্রাস-বৃদ্ধি, মহাবিলুপ্তির প্রারম্ভ; আবার কখনো বড়বড় সব মহাদেশের ভাঙনে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন মহাদেশের, জন্ম হয় দ্বীপ, সাগর, মহাসাগরের। তেমনি আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে, পৃথিবীর দক্ষিণের মহাদেশ গন্ডোয়ানাল্যান্ড ভেঙে আফ্রিকা আর ভারতীয় উপমহাদেশের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে আফ্রিকা থেকে আলাদা হয়ে যায় মাদাগাস্কার। এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলে জুরাসিক যুগের শেষ থেকে ক্রিটেশিয়াস যুগের প্রথম দিক পর্যন্ত, অর্থাৎ পনেরো কোটি বছর আগে থেকে সাত কোটি বছর আগে পর্যন্ত। তারপর মাদাগাস্কারের এক দীর্ঘ আইসোলেশন, একাকিত্বের পথ চলা শুরু। আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে বায়োলজিক্যাল ব্যারিয়ার দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বিবর্তনও এখানে কিছু অত্যন্ত বিস্ময়কর জীবনের সৃষ্টি করে যার প্রক্রিয়াগুলো পরবর্তীতে আমাদের জীবন বিজ্ঞান বইয়ের সিলেবাস বাড়িয়ে দেয়। আর বাড়িয়ে দেয় জীববৈচিত্র্য। এমন কিছু এন্ডেমিক জীববৈচিত্র্য যা শুধুমাত্র মাদাগাস্কারেই পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও যাদের পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন লেমুর, ফোসা, টম্যাটো ফ্রগ, প্যান্থার ক্যামেলিয়ন ইত্যাদি। তবে এসব তো ডাঙার ব্যাপার, আঁশটে ম্যাগাজিনের পাতায় এদের কাজ কি, তারচেয়ে বরং চলুন মাদাগাস্কারের খালে-বিলে-পুকুরের জলে ডুব দিই, খুঁজে দেখি এমন কিছু মাছকে যাঁদেরকে শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের এই দ্বীপটাতেই দেখা যায়।

(১) পেরিট্রপ্লাস মেনারামবো (Paretroplus menarambo):
প্রাথমিক দৃষ্টিতে আপনার এদের দেখে মনে হতেই পারে সামুদ্রিক মাছ বলে,

পেরিট্রপ্লাস মেনারামবো (*Paretroplus menarambo*)

তার জন্য দায়ী এদের আকর্ষণীয় শরীরের গঠন। ১৯৯২ সালে সারোড্রানো হ্রদেতে প্রথম পিনস্ট্রাইপ ডাম্বা (Pinstripe Damba) বা মেনারামবো কে খুঁজে পান জাঁ ক্লড নারিসা (Jean-Claude Nourissat) এবং প্যাট্রিক ডে রাম (Patrick de Rham)। দুর্ভাগ্যবশত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জেলেদের অত্যধিক মাছ ধরার জন্য এই হ্রদে মেনারামবো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং IUCN এর লাল তালিকা ভুক্ত হয়। সম্প্রতি সেনি হ্রদে (lake tseny) পুনরায় এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। সমীক্ষা বলে এই হ্রদ ছাড়াও মাদাগাস্কারের আরো দুটো হ্রদে এ পিনস্ট্রাইপ ডাম্বাকে পাওয়া যায়। বর্তমানে বহু পাবলিক -অ্যাকোয়ারিয়াম আর কৃত্রিম প্রজননকারীদের চেষ্টায় ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে পেরিট্রপ্লাস মেনারামবো (*Paretroplus menarambo*) মেইনস্ট্রিম হবিতে জায়গা করে নিয়েছে।

অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখতে হলে :
অ্যাকোয়ারিয়ামের আকার : একটা পরিণত জোড়ার জন্য সর্বনিম্ন সাড়ে তিন ফুট থেকে চার ফুট অ্যাকোয়ারিয়াম প্রয়োজন।
খাদ্যাভ্যাস: সর্বভূক (Omnivore)
জলের তাপমাত্রা: ২৪-৩০° সেলসিয়াস।
জলের pH: ৭ থেকে ৮ পর্যন্ত
পূর্ণাঙ্গ মাছের আকার : ২৫ সেন্টিমিটার বা প্রায় ১০ ইঞ্চি
প্রজনন: ডিম পাড়া প্রজাতি

(২) পেরিট্রপ্লাস ম্যাকিউলেটাস (Paretroplus maculatus) :
পেরিট্রপ্লাস মেনারামবোর খুব কাছের আত্মীয় এরা। শারীরিক গড়নের দিক থেকেও ম্যাকিউলেটাস আর মেনারামবোর অনেকটাই সামঞ্জস্য। শুধু শরীরের ওপর কালো রঙের বড় দাগটি মেনারামবোদের থেকে এদের পৃথক ভাবে চিনতে সাহায্য করে। মাদাগাস্কারের উত্তর পশ্চিমে ইকোপা ও বেতশিবকা নদীর অববাহিকার অগভীর বন্যা প্লাবিত অঞ্চলগুলোতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরাও একসময় বিপন্ন হয়েছিল আর পাঁচটা মাদাগাস্কারের সিকলিডের মতোই, কিন্তু কিছুদিন আগে লন্ডন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও কিছু ইউরোপিয়ান ব্রিডারদের সহায়তায় এদের ক্যাপ্টিভ ব্রিডিং করানো হয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যাকোয়ারিয়ামের শখে মোটামুটি নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছে।

অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখতে হলে :
অ্যাকোয়ারিয়ামের আকার : একটা পরিণত জোড়ার জন্য সর্বনিম্ন সাড়ে তিন ফুট থেকে চার ফুট অ্যাকোয়ারিয়াম আবশ্যক।

পেরিট্রপ্লাস ম্যাকিউলেটাস (*Paretroplus maculatus*)

পরিণত আকার : ১০ ইঞ্চির কাছাকাছি
খাদ্যাভ্যাস: সর্বভূক (Omnivore)
জলের তাপমাত্রা: ২৪-২৭° সেলসিয়াস
জলের pH : ৭.৫-৮.৫ মাত্রা পর্যন্ত
প্রজনন : ডিম পাড়া প্রজাতি

(৩) পেরিট্রপ্লাস ডামি (*Paretroplus damii*) **:**
IUCN লাল তালিকায় থাকা এই মাছ এখনো উত্তর পশ্চিম মাদাগাস্কারের বিস্তীর্ণ জলভূমি তে পাওয়া যায়। যদিও অত্যধিক মাছ ধরার প্রবণতা কতদিন এদের টিঁকতে দেবে সে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে যথেষ্ট। কালো বা হালকা ধূসর শরীরের ওপর একদম হালকা হলুদ ব্যান্ড এদের অনান্য পেরিট্রপ্লাসের থেকে আলাদা করে। এরাই একমাত্র পেরিট্রপ্লাস স্পিসিস যাদের শরীরে কোনো উল্লম্ব দাগ নেই। সাধারণত মাদাগাস্কার এর উত্তর পশ্চিমে অগভীর জলাশয় ও কম স্রোতের নদীগুলিতে এরা বিরাজমান। সংরক্ষণ এর উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে সারাটানানা জাতীয় উদ্যান থেকে (Tsaratanana National Park) বহু পেরিট্রপ্লাস ডামি (*Paretroplus damii*) কালেক্ট করা হয়।

প্যারেট্রপ্লাস ডামি (*Paretroplus damii*) চিত্র ঋণ : জিম কামিং

(৪) পেরিট্রপ্লাস ডামবাবে (*Paretroplus dambabe*)
বিভিন্ন সূত্র যদিও বলে যে ডামবাবে Mahavavy du Sud basin-এর বিস্তীর্ণ জলাভূমি তে পাওয়া যায় কিন্তু। এখনো অব্দি একমাত্র কিঙ্কোই হ্রদ থেকেই এদের পাওয়া গিয়েছে। মাদাগাস্কার এর উত্তরপশ্চিমে কিঙ্কোই হ্রদ হলো অত্যন্ত অগভীর এক জলাভূমি যা মাজুঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম দিক বরাবর বিরাজমান। ইদানিং জলাভূমি ভরিয়ে ধানচাষ বিপণন করেছে এদের। এটিই এদের একমাত্র পরিচিত বাসস্থান। একদা খুব সাধারণ মাছ হলেও গবেষক

পেরিট্রপ্লাস ডামবাবে (*Paretroplus dambabe*) চিত্র ঋণ : জিম কামিং

কিয়েনার (১৯৬৩) এর মতে যথেচ্ছ ভাবে হ্রদ ভরানো ও বিদেশি মাছের আধিপত্যের জন্য এরাও আজ IUCN লাল তালিকা অনুযায়ী বিপন্নপ্রায় প্রজাতির এর তকমা পেয়েছে।

(৫) প্যারাতিলাপিয়া গণ (Paratilapid genus) :
উপরিউক্ত মাছগুলো ছাড়া আর যে মাদাগাস্কান আমাদের অ্যাকোয়ারিয়াম হবিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে তারা হলো প্যারাতিলাপিয়া। সমস্ত মাদাগাস্কান সিকলিডদের মধ্যে এদেরই সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃতি। সমগ্র পূর্ব উপকূল জুড়ে ছোট বড় হ্রদ, নদী ও খাল বিলের জলরাশিতে প্যারাতিলাপিয়াগণের মাছেদের রাজত্ব। এছাড়াও মাদাগাস্কারের মধ্যভাগে ও দক্ষিণাঞ্চলের কিছু কিছু ছোট ছোট জলরাশি ও এদের বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিঝুম কালো শরীরের ওপর উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছোট বড় (প্রজাতি অনুযায়ী) ছোপ ছোপ দাগগুলো এদের মধ্যে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি প্যারাতিলাপিয়াগণের মাছেদের প্রজাতি সংখ্যা নিয়ে আজও মতভেদ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে *P. polleni* কে একমাত্র প্রজাতি হিসেবে প্যারাতিলাপিয়া গনের মধ্যে আনা হয়। যদিও পরবর্তীকালে নতুন আরও দুটি প্রজাতি *P. bleekeri* ও *P. typus* বর্ণনার মধ্যে আসে। যদিও অনেকের মতে এগুলো সবই একপ্রকার *P. polleni*। বর্তমান সময় পর্যন্ত এরম ৪টি প্রজাতি কে প্যারাতিলাপিয়া গনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে বলাই বাহুল্য যে আগামীদিনে যেমন আমরা এদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখতে পারি ঠিক তেমনই নতুন প্রজাতিরও আবির্ভাব দেখতে পারি।

প্যারাতিলাপিয়া পোলিনি (*Paratilapia polleni*)

(৬) টাইকোক্রোমিস গণ (*Ptychocromis genus*)
একদা মাদাগাস্কান নদী ও হ্রদগুলিতে দাপিয়ে বেড়ানো টাইকোক্রমিস গনের বেশিরভাগ প্রজাতি আজ বিপন্ন। *P. onilahy* কে কিছুদিন আগেই IUCN লিস্টে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী ১৯৬২ সালের পর এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য প্রজাতিগুলির মধ্যে *P. insolitus*, *P. oliggcanthus* ও *P. grandidie* ইত্যাদি রয়েছে। *P. grandidieri* হলো brackish water-এর মাছ। আকার অনুযায়ী মোটামুটি ১০ সেমি থেকে ১৫ সেমি এদের

আকার হয়। এখানে বলতেই হয় কয়েক কোটি বছর আগে হওয়া সেই কন্টিনেন্টাল ড্রিফটের ফলস্বরূপ আমাদের এই ভারতের বুকে মূলত দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে মাদাগাস্কান সিকলিড প্রজাতির সবচেয়ে নিকট আত্মীয় ইট্রোপ্লাস গনের মাছেদের দেখা মেলে, যারা বিবর্তনের হাত ধরে নিজেদের পরিবর্তন করে নিয়েছে।

উপরিউক্ত প্রজাতিগুলি ছাড়াও মাদাগাস্কার বহু সিকলিড প্রজাতির বাসস্থান। যাঁদের মধ্যে অনেকগুলি প্রজাতি বর্তমানে তাঁদের আদি বাসস্থানে কোনো অস্তিত্ব নেই এবং সেগুলি এমনই প্রজাতি যাঁদের শুধুমাত্র মাদাগাস্কারেই দেখতে পাওয়া যেত। এসব হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের জন্য। ক্রমাগত জঙ্গল কাটা, বন্য জীবন ধ্বংস করা আর নিজের জন্য নিত্য নতুন বসতি গড়ে তোলাই আজ স্থানীয় প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে মানুষের চরম খাদ্য সংকট মাদাগাস্কার এর জলভূমিতে আগমন ঘটায় রেড স্নেকহেড এর মতো বিদেশী প্রজাতির, যা স্থানীয় মাছেদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিওবা বিদেশী মাছেদের মাদাগাস্কারে আনার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনবসতির খাদ্য সংকট দূর করা, কিন্তু ঠিক ভিক্টোরিয়া হ্রদের মতোই এখানেও বিদেশি মাছেরাই স্থানীয় মাছেদেরদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র মাছই নয় জলজ গাছপালাও বিদেশী মাছেদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। বিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিদদের পরিসংখ্যান দেখায় বহু স্থানীয় জলজ উদ্ভিদ প্রজাতি শেষ কয়েক দশক ধরে বেপাত্তা! তবে আশার কথা মাদাগাস্কান সিকলিড এর রঙিন মাছের হবিতে আগমন এদের। কিছুটা হলেও বাঁচিয়ে দিয়েছে, ক্যাপটিভ ব্রিডিং-এর মাধ্যমে মাদাগাস্কারের সিকলিড দের কিছুটা হলেও রক্ষা করা গেছে। এই পরিস্থিতি বাধ্য করেছে বহু গবেষক, প্রকৃতিবিদ ও অ্যাকোয়ারিয়াম ক্লাবগুলোকে পদক্ষেপ নিতে। মূলত তাদেরই উদ্যোগেই শেষ দশকে মাদাগাস্কারের কিছু স্থানীয় মাছেদের ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে মাদাগাস্কান সিকলিডদের টিকিয়ে রাখতে এই উদ্যোগ সাফল্যও পেতে শুরু করেছে। মাছ পুষিয়েদের কাছে পরিচিতি পাওয়ার ফলে মাদাগাস্কারের সিকলিডের চাহিদা বাড়ছে, ক্যাপ্টিভ ব্রিডিং-এর প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়ছে বহু দেশেই। এর ফলে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা এসব প্রজাতিকে আবার তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানে ফিরে পেতে পারি। যদি তাই হয় তবে এর থেকে বড় পাওনা আর কি বা হতে পারে। ভালো থাকুক মাদাগাস্কার ও তার অফুরন্ত জীববৈচিত্র্য!

ছবি – ইন্টারনেট

কিঙ্কোই জলাভূমি, মাদাগাস্কারের সিকলিডদের বাসস্থান

For Creation and Maintenance of Natural Pond, Artificial Pond, Lily Pool, Koi Pond and other Aquascapping, Landscaping, creation of Urban Forest, Orchard, Kitchen Garden, Roof Garden

Contact

BioMates

6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9477275731

BioMates
for a beautiful world

ANIMAUX AQUATIQUES

Believe in quality not in quantity

‖ Malawi cichlid ‖ Tanganyikan cichlid ‖ Central American ‖ South American ‖

Wholesale & Retail

Contact details:8910296663

Animaux Aquatiques
@animauxaquatiquesstore

।। মাছের বাবা মাছের মা।।

সৌম্য সরকার

২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া অ্যানিমেশন ছবি ফাইন্ডিং নিমোর সেই ছোট্ট ক্ষুদে ক্লাউনফিশের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। নিমো নামের কমলা সাদা একরত্তি মাছটার কাণ্ডকারখানায় মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা সবাই। আর নিমোকে মনে থাকলে তার বাবা মার্লিনের কথাও মনে থাকা উচিত! ছোট্ট ছেলের বিপদে সমুদ্র তোলপাড় করে ফেলেছিল মাছটা, ওইটুকু শরীর নিয়ে তিমি, হাঙর কি বিষাক্ত জেলিফিশের সঙ্গে টক্কর দিতে দুবার ভাবেনি। নিত্য নতুন ফন্দি এঁটে কাটিয়ে দিয়েছে একের পর এক সমস্যা। সিনেমা তো নাহয় এমনভাবে বানানো যাতে পর্দায় আমরা নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পাই। কিন্তু রুপোলি পর্দার বাইরেও কি মাছ বাবা-মা এমনি হয়? বাচ্চাকাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য তারা কি নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়? কোনো মতলব আঁটে? কেমন হয় মাছের বাবা-মায়েরা? আজ সেই গল্পই শোনাবো।

নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি বাবা-মায়ের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা, যা আমাদের মনুষ্যসমাজ ভীষণ সহজাত বলে মনে করে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Parental Care. এককথায় যার মানে করতে হলে বলতে হয়, Parental care হল বাবা-মায়ের মূল্যবান সময় এবং এনার্জি ব্যয় করে করা প্রতিটা কাজ, যা বাচ্চাকাচ্চার বেঁচে থাকার হারকে (survival rate) বাড়ায়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বিবর্তনের বহুতলে ওপর তলার বাসিন্দারা Parental Care দেখায় অনেক বেশি। সেই হিসেবে খুব কমই স্তন্যপায়ী কি পাখি বাবা-মায়ের আদর-যত্ন পায় না। মাছের মধ্যে কিন্তু ব্যপারটা উলটো! বেশিরভাগ মাছই কিন্তু বিপুল সংখ্যায় ডিম পেড়ে এবং তাকে নিষিক্ত করে নিজের অভিভাবকত্বে ইতি টানে। তুলনায় খুব কম মাছই (হিসেবে মাত্র ২৩% মতো) ডিম কি ছানাপোনাদের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য মাছের প্রজাতি সংখ্যার নিরিখে ২৩% সংখ্যাটাও বড় একটা কম নয়। তাদের Parental Care-এর পদ্ধতিও হাজার রকম, আর সেখানেও যে অজস্র রকমফের থাকবে সেটাও স্বাভাবিক। কোথাও যত্ন-আত্তির দায়িত্বে বাবা তো কোথাও সিঙ্গেল মাদার, কোথাওবা বাবা-মা সমান তালে পুতুপুতু করে মানুষ (!) করছে ছানাদের। এখন এই ছোট্ট পরিসরে পুরোটা বলাও তো ভীষণ মুশকিল। আমি বরং মাছের অভিভাবকত্বের মূল ধরনগুলোর কথা উল্লেখ করে সেই সম্বন্ধীয় গল্পগুলো বলি।

ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার ডিমটি রেখো:

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বেশিরভাগ মাছেরই ছোটবেলা শুরু হয় ডিম থেকে। আর মাছের অভিভাবকত্বের সবথেকে প্রথম চ্যালেঞ্জ ডিমগুলোকে নিরাপদ রাখা। অনেক শিকারী মাছের কাছেই অন্য মাছের ডিম পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ লোভনীয় খাবার। তাছাড়া ডিম তো আর বিপদ দেখলে সাঁতরে নিজেকে লুকোতে বা পালাতে পারবে না। তো এই ডিমকে নিরাপদে রাখার প্রাথমিক উপায় হল এমন কোনো জিনিসের গায়ে ডিমগুলোকে আটকে রাখা যেটা হঠাৎ হারিয়ে যাবে না বা সহজে কেউ নাগাল পাবে না। যাদের অ্যাকোয়ারিয়ামে এঞ্জেলফিশ ডিম পেড়েছে তারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছে জিনিসটা। প্রকৃতিতেও এঞ্জেলরা এভাবেই কোনো গাছের পাতায় কি ডালে নিজেদের ডিমগুলো আটকে রাখে। তারপর সেখানে ঘাঁটি গেড়ে চলে পাহারা যতক্ষণ না বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরোচ্ছে। অনেক সেন্ট্রাল আমেরিকান এবং আফ্রিকান সিকলিডও এই পদ্ধতিতে নিজেদের ডিমকে প্রাথমিক সুরক্ষা দেয়। তবে আঠা দিয়ে ডিম সাঁটানোর এই পদ্ধতি যে শুধু বিদেশিরা রপ্ত করেছে তা নয়। আমাদের নানান দেশীয় মাছও কিন্তু আঠা দিয়ে ডিম সাঁটানোয় ওস্তাদ। ফলুইমাছ *(Notopterus notopterus)* এরকমই নিজের ডিম আটকে রাখে জলজ ডুবিগাছের পাতায়। তারপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ডিম ফোটার।

স্প্ল্যাশ টেট্রা

তবে এই বিষয়ে দক্ষতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে আমাজনের একটা ছোট্ট মাছ, স্প্ল্যাশ টেট্রা *(Copella arnoldi)*। আমাজন বেসিনের ছোট ছোট নদীনালাগুলোতে এদের ঘরবাড়ি। চার পাঁচ সেন্টিমিটারের ক্ষুদে মাছগুলো ডিমপাড়ার জন্য বেছে নিয়েছে এক দারুণ উপায়। অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে স্প্ল্যাশ টেট্রা ডিম পাড়ে জলের বাইরে! নদীনালার ওপর ঝুলে থাকা গাছের পাতা এদের প্রাথমিক পছন্দ। গিন্নিকে রাজি করানোর আগে কর্তা জল থেকে বারবার লাফিয়ে খুঁজে নেয় সুবিধা মতো ঝুলন্ত পাতা। তারপর সাইজে ছোট গিন্নিকে পাশে নিয়ে পাক্কা সিনক্রোনাইজড সুইমারের এর দক্ষতায় একসঙ্গে জল থেকে লাফিয়ে পাতায় উঠে পড়ে। শ্রোণি পাখনা দিয়ে পাতায় কিছুক্ষণ আটকে থেকে চলে ডিমপাড়া। প্রায় সেকেন্ড দশেক পর দুজনে আবার জলে ফিরে আসে। স্প্ল্যাশ গিন্নি প্রতিলাফে পাতার ওপর অন্তত দশ বারোটা ডিম পাড়তে পারে। কর্তা গিন্নির এই সিনক্রোনাইজড লাফ চলতেই থাকে যতক্ষণ না ফিমেল সবকটা ডিম পাতায় আটকে দিচ্ছে। এরপর মায়ের ছুটি। বাবা স্প্ল্যাশ এবার ডেরা ফেলে ডিম নিয়ে ঝুলন্ত পাতার নিচে। কিছু সময় অন্তর লেজের ঝটকার অব্যর্থ নিশানায় জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে থাকে প্রতিটা ডিম। নাহলে জলের বাইরে বাছারা শুকিয়ে মরবে যে। মজার ব্যপার মাঝেমধ্যে স্প্ল্যাশ গিন্নি একাধিক পাতায় ডিম পাড়লে কিংবা কর্তার একাধিক

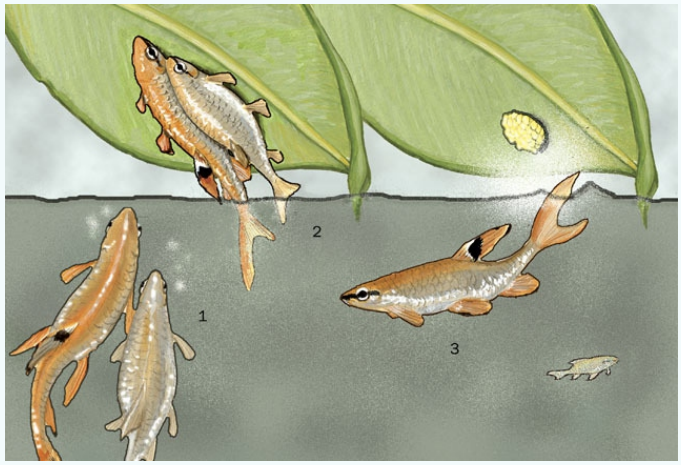

জল থেকে লাফিয়ে উঠে গাছের গায়ে ডিম পাড়া আমাজনের স্প্ল্যাশ টেট্রা

পত্নীর সংসার থাকলেও তিনি প্রতিটি পাতা মনে রেখে ঘুরেফিরে সবকটায় জলের ছিটে দিতে ভোলেন না। কেমন দায়িত্বশীল বাবা একবার ভেবে দেখুন! যাইহোক আড়াই তিন দিন পর কচি স্প্ল্যাশ টেট্রারা ডিমফুটে বেরোয় এবং আপনা আপনিই নিজেদের গাছবাড়ির আঁতুড় থেকে টুপটাপ জলে খসে পড়ে। তখন বাবার ছুটি, বাচ্চারা এবার নিজেরাই নিজেদের ভালোটা বুঝে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে স্প্ল্যাশ বাবা-মা সফলভাবে আমাজনের মতো নির্দয় পরিবেশে নিজেদের বাচ্চাদের প্রাথমিক পর্যায়ের নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছে।

উত্তর আমেরিকার উত্তর সীমানার মিসিসিপি নদীর মাছ হলদে পার্চের (*Perca flavescens*) গল্পটা আবার অনেকটা আলাদা। স্পনিং-এর সময় একটা স্ত্রী পার্চের সঙ্গে চার-পাঁচটা পুরুষ গা-ঘেঁষাঘেষি করলেও বাচ্চাকাচ্চার দায় দায়িত্ব কেউ নেয় না। কিন্তু মা পার্চ ডিমটা পাড়ে মোক্ষম। একটা লম্বা থকথকে জেলি জাতীয় ফিতের মোড়কে ডিমের গোছা ঝুলিয়ে দেয় কোনো পাথর বা জলজ গাছের পাতায়, ফলে জলের স্রোতে ডিমগুলো এখান ওখান ছড়িয়ে পড়েনা। প্রায় তেইশ হাজার ডিম সম্বলিত এই জেলির ফিতে বা Egg strand লম্বায় ছ'ফুট পর্যন্ত হতে পারে আর ওজনে প্রায় ন'শো গ্রাম। বিজ্ঞানীদের মতে এই Egg strand অন্যান্য শিকারী মাছের খপ্পর থেকেও ডিমগুলোকে সুরক্ষা দেয় কারণ জেলির আবরণটা মাছের কাছে কুখাদ্য বা বলা চলে এই জেলি হজমের ক্ষমতা শিকারী মাছগুলোরও নেই। খানিকটা একই রকম ফন্দি এঁটেছে আমেরিকার আরেক বাসিন্দা অ্যালিগেটর গার ফিশ (*Atractosteus spatula*)। যাদের মনস্টার ফিশ কিপাররা অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে দৈত্যকে বোতল-বন্দি করার আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং অনেকেই পরে স্থানীয় জলাশয়ে ছেড়ে জীববৈচিত্র্যের বারোটা পাঁচ বাজায়। যাই হোক, বিবর্তনের ধারা এদের ডিমটাকেই বানিয়েছে বিষাক্ত। তবে মজার ব্যপার গারের বিষের লক্ষ্য অন্যান্য মাছ নয়! কোন মাছেরই বা কলজেতে এত জোর আছে যে অ্যালিগেটর গারের ডিম খেয়ে নেবে! কিন্তু গার-রা বর্ষার জমা যে অল্প নাব্যতার জলে স্পন করে, সেখানে ডিমের সম্ভাব্য শিকারী হতে পারে জলের নানা পাখি, চিংড়ি-কাঁকড়ারা। গারের ডিমের বিষের প্রাথমিক লক্ষ্য এরাই। ডিমের গরল এদের সবাইকে বিপদে ফেলার জন্য যথেষ্ট, আর সেটা এইসব প্রাণীরা খুব ভালো মতোই জানে এবং পারতপক্ষে জলার গাছপালার গায়ে লাগানো গারফিশের ডিম ছুঁয়েও দেখেনা। সর্বভুক মানুষের ওপরও কিন্তু গারের ডিমের প্রভাব যথেষ্ট। জন্মের দশ বছর পর প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করা গার-মায়ের মূল্যবান ডিম এভাবে শুরুতেই নিরাপত্তার প্রথম ছোঁয়া পায়। হলই বা সে ছোঁয়া বিষাক্ত!

১৯১০ সালে মিসিসিপির মুন লেক থেকে ধরা দশ ফুটিয়া অ্যালিগেটর গার

হাঙরদের মধ্যে যারা ডিম দেয় তারা আবার প্রতিটা ডিমকে বিশেষ রকমের আস্তরণে ঘিরে রাখে। কোলাজেন প্রোটিনে তৈরি এই আস্তরণের নাম egg pouch, যা তারা বসিয়ে দেয় সুবিধাজনক জায়গায়। কখনো জলজ ঘাসের বনে, কখনো প্রবাল প্রাচীরে আবার কখনো সরাসরি অগভীর সমুদ্রতলে। এগ-পাউচগুলোর প্রান্তগুলোও হয় স্প্রিং-এর মতো, আঁকড়ে ধরে আসেপাশে যা পায়। তারপর পাউচের মধ্যেই চলতে থাকে ডিমের ক্রমবিকাশ। নির্দিষ্ট

মৎসকন্যার হাতব্যাগে বড় হচ্ছে হাঙরের ছানা

সময় শেষে বাচ্চা হাঙর পাউচ কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে। এখানে একটা দারুণ গল্প লুকিয়ে আছে। হাঙরের এগ-পাউচের বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা আসার আগে সমুদ্র তীরবর্তী মানুষ বিশ্বাস করতো এই পাউচগুলো আসলে মৎস্যকন্যাদের হাতব্যাগ। তাই এগুলোর প্রচলিত নাম Mermaid's purse. অবশ্য শুধু হাঙর নয়, যে সমস্থ তরুণাস্থি যুক্ত মাছেরা (Elasmobranchi) ডিম পাড়ে তাদের সবার ক্ষেত্রেই এগ-পাউচের ব্যবহার দেখা যায়।

আরেকটা মাছের কথা না বললেই নয়, যার নাম ইউরোপিয়ান বিটারলিং (*Rhodeus amarus*)। ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ার ছোট ছোট নদী জলাশয়ের এই খুদে মাছগুলো নিজের ডিমের নিরাপত্তার জন্য যা ফন্দি এঁটেছে তার কোনো দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ব্রিডিং সিজনে পুঁটির আকারের বিটারলিংরা ডিম পাড়ে মিষ্টি জলের ঝিনুকের মধ্যে। কেউ ঝিনুকদের বেঁচে থাকার ধরন জানলে, এদের অ্যাকোয়ারিয়াম ফিল্টারের প্রাকৃতিক সংস্করণ বলতে দু'বার ভাববে না। অবিরাম ইনলেট দিয়ে জল ঢুকিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছেঁকে নিয়ে আবার আউটলেট দিয়ে বার করে দিচ্ছে। প্রজনন ঋতুতে ফিমেল বিটারলিং তার লম্বা ওভিপোজিটর (ডিম পাড়ার নল বলা চলে) ঢুকিয়ে দেয় ঝিনুকের ফুলকার আউটলেটে। ডিম পাড়ে ঝিনুকের গিল-ফিলামেন্টের খাঁজে খাঁজে। ওদিকে কর্তা বিটারলিং তার স্পার্ম ছাড়ে ফিল্টার ইনলেটে, যা ঝিনুকের তৈরি জলের একমুখী স্রোতে প্রবাহিত হয়ে নিষিক্ত করে গিল ফিলামেন্টের ডিমগুলোকে। বাকিটা রুদ্রর কবিতা "পুষে রাখে যেমন ঝিনুক খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ..." তিন থেকে চার সপ্তাহ পর সদ্যোজাত বিটারলিং ঝিনুকের আউটলেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রকৃতির এরকম সেফ ডিপোজিট লকার আর দ্বিতীয় আছে কি? মজার কথা হল বিটারলিং কর্তা গিন্নি একে অপরকে দেখার থেকেও বেশি যৌন উত্তেজনা অনুভব করে উপযুক্ত ঝিনুকের খোঁজ পেলে।

ঝিনুকের মধ্যে ডিম পাড়তে উদ্যত বিটারলিং কর্তা গিন্নী

নীড় ছোট ক্ষতি নেই:

বাচ্চা কাচ্চার জন্য বাবা-মায়ের বানানো ঘরের থেকে আর সুরক্ষিত জায়গা হয় নাকি! পাখিদের আবার এই জায়গাটায় দারুণ রমরমা। জলের ওপর ভাসমান পানডুবির বাসা হোক বা গাছের ডালে ঝুলন্ত বাবুইয়ের বিখ্যাত শিল্পকলা, বাসা বানানোর ব্যাপারটায় পাখিদের টেক্কা দেওয়া ভীষণ মুশকিল। কিছু স্তন্যপায়ীও কিন্তু রীতিমতো বাসা বানায়। মাটির নিচে ইঁদুরদের সাতমহলা প্রাসাদ হোক বা গাছের কোটরে কাঠবেড়ালীর ঘরসংসার, সবই কিন্তু আগামী প্রজন্মের নিরাপত্তার কথা ভেবে। কিন্তু মাছের বাসা? মানুষের দৃষ্টির আড়ালে জলের তলায় থাকে বলে বেচারারা হয়তো বিশেষ পাত্তা পায় না, কিন্তু তাদের দলেও কেউ কেউ আছে যারা নিজের ছানাপোনাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বাসা বানায়। এখন সেই বাসা। পাখিদের মতো দৃষ্টিনন্দন নাই বা হল। এই যেমন আফ্রিকার তিলাপিয়ারা, পুরুষ মাছ জলের নিচের মাটি খুঁড়ে অগভীর বাটির আকার দেয়, তারপর প্রেম নিবেদন করতে থাকে সোমত্ত রমণীদের। বাসা মনমতো হলে মা মাছ বাটির মাঝখানে গিয়ে ডিম পাড়ে তারপর দুজনে মিলে বাসা আগলে ছানা-পোনাদের জন্য জানপ্রাণ লড়িয়ে দেয়। এখন তো তিলাপিয়ারা আমাদের দেশীয় জলাভূমিগুলো ছেয়ে ফেলেছে। গ্রীষ্মে এখানকার অনেক জলা কি পুকুরে জল কমলে মাটিতে কিছুদুর অন্তর এরকম অগভীর বাটির আকারের। বাসা হামেশাই দেখা যায়। আবার আমাদের নাপতে কইয়ের (*Badis badis*) মতো অনেকেই জলের তলায় কোনো উপযুক্ত ফোকর পেলে সেটাকেই নিজের বাসা বানিয়ে ফেলে। তারপর সিংহদুয়ারে পাখনার বাহার দেখিয়ে চলে প্রেমিকার মন পাওয়ার চেষ্টা। প্রেমিকা রাজি হলে বাসায় ঢুকে ডিম পেড়ে আসে। তারপর বাচ্চাদের সাঁতার কাটতে শেখা পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব বাবার।

মাটি খুঁড়ে অগভীর বাসা বানিয়েছে পুরুষ তিলাপিয়া

পূর্ব আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের শেল-ডুয়েলাররা বাসা বাঁধতে শিখেছে শামুকের ফাঁকা খোলে। বাচ্চারা পেয়েছে শিকারী মাছেদের হাত এড়িয়ে এক নিরাপদ আশ্রয়।

লাং-ফিশের মতো কিছু মাছ আবার জল-কাদায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেখানেই ডিম পাড়ে। আমাদের পরিচিত মাছের মধ্যে কুচে (*Monopterus cuchia*) এইরকম কাদার সুড়ঙ্গ বানিয়ে সেটাকেই বাচ্চাদের আঁতুড় বানায়।

খলসে জাতীয় মাছরা আবার অন্য ফিকির খুঁজে নিয়েছে। বাবা খলসে প্রেমে পড়লে জলাশয়ের অগভীর অংশে জলের উপরিভাগে ভাসমান গাছপালার দামে মুখ দিয়ে বুদবুদের থোকা তৈরি করে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় কে যেন জলের ওপর থুতু ফেলেছে। তারপর প্রেমিকাকে ওই বুদবুদের ঝাড়বাতির নিচে নিয়ে এসে চলে প্রেম নিবেদন। অবশ্য এই গল্পে মা-খলসের ভূমিকা ডিম দেওয়া পর্যন্ত। বাবাই দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকটা নিষিক্ত ডিমকে এক-এক করে মুখে নিয়ে আটকে রাখে ওই বুদবুদের বাসায়, যার পোষাকি নাম বাবল নেস্ট। হবু বাবা তারপর ওই বাসার নিচে ডেরা বাঁধে যতক্ষণ না কচিকাঁচারা ডিমফুটে বেরিয়ে নিজেরা সাঁতার কাটা শিখছে। এই সময় বাবা খলসেদের মেজাজ থাকে সপ্তমে। নিজের দেড় দুগুণ সাইজের মাছকেও বাসার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না। আমাদের আশেপাশের খালবিলের অত্যন্ত পরিচিত পাটা খলসে, গুঁড়ি খলসে থেকে শুরু করে চুনা খলসে সবাই এই বুদবুদের বাসা বানিয়েই আর সেগুলো সফলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায়। খলসের নিকটাত্মীয়, শখের অ্যাকোয়ারিয়ামের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ ফাইটারের (*Betta sp.*) বেশিরভাগ প্রজাতিও কিন্তু বাবল নেস্ট বানায়। আমরা যারা কোনো না কোনো সময় ফাইটার রেখেছি তাদের সবারই আশাকরি জলের উপরিভাগে বুদবুদের আস্তরণ দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ফাইটার মাছের বুদবুদের বাসা

তবে বাসা বাঁধা মাছের জগতে দু'একজন বিশ্বকর্মার চ্যালা থাকবে না তা কি হয়! উত্তর আমেরিকার পূর্ব আর পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দা থ্রি-স্পাইনড স্টিকলব্যাক (*Gasterosteus aculeatus*) নামের এক একরত্তি মাছের কাণ্ড

ঘাস-পাতা দিয়ে বাসা বানাচ্ছে স্টিকলব্যাক পুরুষ

ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী স্টিকলব্যাকের সরেজমিন তদন্ত

বাসার দুয়ার খুলে স্ত্রী কে ঘরে ঢোকাচ্ছে পুরুষ স্টিকলব্যাক

কারখানা শুনলে অবাক হতে হয়। পুরুষ স্টিকলব্যাক প্রথমে অগভীর জলে বাসা বানানোর উপযুক্ত জায়গা সন্ধান করে। জলের স্রোত হবে পরিমিত কিন্তু দেখতে হবে তা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। সঙ্গে থাকতে হবে কিছু ডুবি গাছপালা। ভূমিপুজো সম্পন্ন করার পর শুরু হয় গাছের টুকরো, শেকড়বাকড়, শ্যাওলা এইসব নির্মাণ সামগ্রী জড়ো করার কাজ। এরপর মাছটা নিজের বৃক্ক নিসৃত একটা বিশেষ রকমের আঠালো পদার্থ দিয়ে জড়ো করা জিনিসপত্র গুলো জোড়ার কাজে হাত দেয়। অতঃপর তৈরি হয় জলের গাছের গায়ে আটকানো সুড়ঙ্গ আকারের স্টিকলব্যাকের ডেরা। একমুখী সুড়ঙ্গের একদিকে প্রবেশপথ অন্য দিকে বাইরে যাবার রাস্তা। দৈর্ঘ্যও খুব একটা লম্বা নয়, কোনো রকমে তিন চার সেন্টিমিটারের মাছটা সেঁধিয়ে যেতে পারে। এরপর চলে সঙ্গিনীর খোঁজ। কিন্তু শুধু মুখের কথায় তো আর চিঁড়ে ভিজবে না, তাই সঙ্গিনীর সামনে নির্দিষ্ট কিছু স্টেপ বজায় রেখে নাচানাচি করে মনের গোপন বাসনাটি ব্যক্ত করতে হয়। প্রেমিক স্টিকলব্যাকের নাচ আর পেটের লাল রঙে মজলে, মাথা নামিয়ে লেজ আকাশপানে করে প্রায় শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে প্রেমিকা সম্মতি জানায়। প্রেমিক খুলে দেয় সুড়ঙ্গ বাসার প্রবেশপথ। সঙ্গিনী বাসায় ঢুকে কয়েকটা ডিম পেড়েই খিড়কির দরজা দিয়ে কেটে পড়ে। এরপর গল্পের নায়কের ডিম নিষেক করার পালা। কিন্তু ততক্ষণে প্রেমিকা গেছে ভেগে। নায়ক আবার ছোটে নতুন প্রেমিকা খুঁজতে। আবার নাচানাচি, আবার সুড়ঙ্গ বাসায় তাকে টেনে এনে কয়েকটা ডিম পাড়িয়ে সেগুলোকে নিষিক্ত করা এবং আবার জানলা দিয়ে বউ পালানো। এই ঘটনা ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ সুড়ঙ্গবাসা ডিমে ভরে ওঠে। একাধিক প্রেমিকার সন্তানসন্ততিদের একঘরে একসঙ্গে পালন করার দায়িত্ব এরপর বাবা স্টিকলব্যাকের একার। প্রেমিকা স্টিকলব্যাকগুলো শুধু কয়েকটা ডিম দিয়েই যে পালায় তাই নয়, নিজে ডিম দেওয়ার সময় আগের প্রেমিকার দেওয়া ডিম খেয়ে নিতে সদাপ্রস্তুত থাকে! আমাদের হিরো কিন্তু এসব ব্যাপারে দারুণ সজাগ। কড়া নজর রাখে যাতে নতুন প্রেমিকা আগের মা-দের ডিমগুলোর ক্ষতি না করতে পারে। দরিয়াদিল প্রেমিক হওয়া যদি গুণ হয় তবে স্টিকলব্যাকদের টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়!

তোমাদের হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না :

ছেড়ে দিলে কি হয় সেটা পরের কথা, আগে বলি বাবা-মা মাছ কচিকাঁচাদের কিভাবে ঠাঁই দেয়। তা সে হৃদ মাঝারে হোক বা অন্য কোনো জায়গায়! অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশ হিসেবে আরোয়ানার জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। দক্ষিণ আমেরিকা আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি বাসিন্দা আরোয়ানাদের একটা ডাকনাম আছে, water monkey! কেন? এদের স্বভাব নদীর উপরিভাগে সুবিধামতো জায়গায় এসে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করা। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া কোনো গাছের ডালে বা পাতায় যদি কোনো পোকা-মাকড় এসে বসে তো ব্যাস! এক লাফে জল থেকে বেরিয়ে পোকাটাকে মুখে নেওয়া এদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়! জল থেকে ছ'ফুট পর্যন্ত লাফ মারার কথাও হামেশাই শোনা যায়। এমনকি বন্যার জলে ডোবা জঙ্গলে গাছের নিচু ডালে বসা ছোট পাখিও প্রায়শই আরোয়ানার কবলে পড়ে। কিন্তু এসব তো আর

নিষিক্ত ডিম মুখে তুলে নিচ্ছে বাবা আরোয়ানা

বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামে দেখা যায় না। কাচ বাক্সে দৈত্য পুষলে তাকে কি আর লাফ মারতে দেওয়া চলে! তাই শখে আরোয়ানা পুষলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করার বিশেষ সুযোগ মেলে না। ঠিক এই কারণেই এদের প্রেমপর্ব আর অভিভাবকত্বের গল্পটা না-শোনাই থেকে যায়। পছন্দমতো সঙ্গিনীর সঙ্গে জুড়ি বাঁধা এবং সফল স্পনিং-এর পর বাবা আরোয়ানা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে নিষিক্ত ডিমগুলোকে নিজের মুখে তুলে নেয়। আরোয়ানা একবারে তিরিশ থেকে একশোটা পর্যন্ত ডিম দিতে পারে আর ডিমের সাইজও তো কম নয়! হাফ ইঞ্চি সাইজের হলুদ বলের মতো অতগুলো ডিম নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে চলে বাবার প্রতীক্ষা! ডিমফুটে বেরিয়ে সাঁতার কাটতে শিখে যতক্ষণ না বাচ্চারা সাবলম্বী হচ্ছে ততক্ষণ বাবার মুখই এদের নার্সারি স্কুল। আর এই গোটা সময়, তা প্রায় দু'মাস, না খেয়েদেয়েই কাটিয়ে দেয় বাবা আরোয়ানা, শুধুমাত্র সন্তানসন্ততির মঙ্গলার্থে! তবে আরোয়ানা শুধু নয় আরো বেশ কিছু বাবা মাছ নিজেদের মুখের মধ্যেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের বড় করে। যেমন নোনা জলের কার্ডিনাল ফিশরা (Family Apogonidae)। এদের পরিবারের সব বাবা মাছই মুখের ভিতর ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখে। বাঞ্জাই কার্ডিনাল ফিশ তো মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামে বেশ পরিচিত মাছ। ট্যাঙ্কে ব্রিড করাতে পারলে বাবা মাছেদের সেবাযত্ন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আছে।

মুখে ডিম নিয়ে ইয়েলো-হেডেড জ'ফিশ বাবা

মা-মাছরা কি তবে পিছিয়ে পড়লো? মোটেই না! কিছুক্ষণ আগেই তিলাপিয়া মাছের বাসা বানানোর কথা বলেছিলাম না? সেই বাসাতেই সফল স্পনিং এর পরই মা মাছ নিষিক্ত ডিম তুলে নেয় মুখে। তারপর গল্পটা কাছাকাছি একই। আর পূর্ব আফ্রিকার রিফ্ট ভ্যালির লেকগুলোতে তো মুখের মধ্যে ডিম ফোটানো মা-মাছের ছড়াছড়ি। আমাদের অতি পরিচিত লেক মালাউই-র মবুনা, পিকক, হ্যাপ সিকলিডরা ঝাড়ে গুষ্টিতে প্রায় সবাই এই দলে নাম লিখিয়েছে। লেক ট্যাঙ্গানিকান সিকলিড়দের অনেকেরই এই স্বভাব আছে। দক্ষিণ আমেরিকার জিওফেগাস সিকলিডরাও মুখের মধ্যে ছানাপোনাদের রাখতে পটু। কিছুক্ষেত্রে তো বাবা-মা দুজনেই পালা করে বাচ্চাদের মুখে রাখে। হ্যাঁ এই ব্যপারে সিকলিড পরিবারের একটা রমরমা থাকলেও কিছু ক্যাটফিশও এই কৃতিত্বের অংশীদার হয়েছে। যেমন লেক ট্যাঙ্গানিকার স্প্যাচুলা-বার্বেলড ক্যাটফিশ (*Phyllonemus typus*), এরা বাবা-মা দুজনেই বাচ্চাদের মুখে লুকিয়ে রাখে।

যাই হোক বাচ্চাদের সেবাযত্নের এই অদ্ভুত পদ্ধতির নাম মাউথ-ব্রুডিং। কি লাভ হয় মাউথ-ব্রুডিং করে? প্রথমটা অবশ্যই নিরাপত্তা। আন্ডা লোভী শিকারী, সে অন্য প্রজাতিরই হোক কি নিজের, ডিমের নাগাল পাওয়া মুশকিল। তারপর আছে আশেপাশের পরিবেশে কোনো সমস্যা দেখা দিলে চট করে বামাল সমেত ফেরার হওয়ার সুযোগ। তাছাড়া মাউথ-ব্রুডার মাছের নিষিক্ত ডিম থেকে সদ্যোজাত বাচ্চাদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা ওই মুখের মধ্যে নড়াচড়াটা খুব দরকারি। মাছের ভ্রূণ থেকে শুরু করে সদ্যোজাত বাচ্চাদের প্রথম খাবার ডিমের সাথেই ইনবিল্ড অবস্থায় জোড়া থাকে। যাকে আমরা কুসুম

বিপদ বুঝে মা তিলাপিয়ার মুখে ফিরে আসছে ছানারা

বাবা সি-হর্স ব্রুড পাউচ থেকে বাচ্চাদের জন্ম দিচ্ছে

বা egg yolk বলে থাকি। মাউথ ব্রুডারের ভ্রূণ এবং বাচ্চার সর্বদা অক্সিজেন সমৃদ্ধ ফ্রেশ জলের জোগান চাই, নতুবা এদের ডিমের কুসুম অংশ শক্ত হতে থাকে এবং টান পড়ে খাবারে। স্বভাবতই যার অন্তিম ফলাফল ভালো হয় না। কিন্তু অক্সিজেন সমৃদ্ধ তাজা জলের মধ্যে নাড়াচাড়া করলে সব চাঙ্গা থাকে। আর মাছের মুখগহ্বরে কানকোর আসেপাশের থেকে বেশি অক্সিজেন সমৃদ্ধ জল আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে! কষ্টটা বাবা-মায়ের। বিন্দুমাত্র খাবার না খেয়ে, নিজের স্বাস্থ্যকে সঙ্কটে ফেলে টানা এতদিন বাচ্চার সেবাযত্ন করা, হিতাহিত চিন্তা করা মুখের কথা নয়! অধিকাংশ অভিভাবককেই সফল ব্রিডিং এর পর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হয়। কিন্তু টান শুধুই খাবারে পড়লে তাও একরকম হতো। গবেষণায় প্রমাণিত যে মুখ ভর্তি ছানাপোনা নিয়ে দীর্ঘদিন থাকা, মাছেদের শ্বাসকার্যে রীতিমতো প্রভাব ফেলে। পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে টিস্যু সিস্টেমে হাইপক্সিয়া দেখে দিতে পারে। কিন্তু তাও ন'টা ফ্যামিলির তিপ্পান্ন জেনেরার মাছ মাউথ-ব্রুডিং-এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে চলেছে, হ্যাঁ নিজের স্বাস্থ্যকে চ্যালেঞ্জ করেই।

তবে এত ঝামেলার মধ্যে যায় না আরেকটা ছোট্ট মাছ নার্শারিফিশ (*Kurtus gulliveri*), পাপুয়ানিউগিনির দক্ষিণে আর অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের খাঁড়িগুলোতে এদের বসবাস। এদের পুরুষদের মাথায় আছে একটা স্পেশাল হুক, যাতে আটকে রাখে নিষিক্ত ডিমের পুঁটলি। বাচ্চাদের যে ছোট থেকে মাথায় তুলতে নেই সেটা ওদের কে বোঝায়! আরো দুটো মাছ ছানাপোনাদের মুখে না নিয়ে, মাথায় না তুলেও সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাঙ্গো ক্যাটফিশ (*Platystacus cotylephorus*) আর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমুদ্রের মাছ ঘোস্ট পাইপফিশ (*Solenostomus paradoxus*)। এদের মায়েরা করে কি নিষিক্ত ডিমগুলো সাঁটিয়ে নেয় নিজের পেটে। এদের পেটের নিচের অংশে থাকা কটিলিফোর (cotylephore) নামের কিছু সূক্ষ্ম বৃন্তে আটকে যায় ডিমগুলো। শুধু তাই নয়, কটিলিফোরের মাধ্যমে ডিমগুলো মায়ের থেকে পুষ্টি দ্রব্যও পেয়ে থাকে। এরপর যদি বলি মাছের বাচ্চাদেরও মায়ের সঙ্গে 'নাড়ির টান' আছে। অবিশ্বাস করবেন?

বাবা সি-হর্স কিন্তু আপত্তি জানাতেই পারে! পৃথিবীতে একমাত্র তারাই জোর গলায় বলতে পারে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব কি শুধু মায়ের? এদের ব্যাপার-স্যাপারই উলটো। প্রেমপর্বের শেষে সি-হর্স প্রেমিকা অনিষিক্ত ডিমে ভরিয়ে দেয় প্রেমিকের পেটের ব্রুড পাউচ। এই পকেটের মধ্যেই নিষিক্ত হয় ডিম এবং প্রেমিক গর্ভাবস্থা লাভ করে। এরপর বাবা ব্রুড পাউচের মধ্যেই ডিমগুলোকে পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন জোগান দেওয়ার কাজ করে। বাচ্চারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও পায় বাবার দেহ থেকে আসা পুষ্টিদ্রব্যের মাধ্যমে। গর্ভাবস্থার শেষে বাবা সি-হর্স হাজার খানেক ছানাপোনার জন্ম দেয় ব্রুড পাউচ থেকে। তারপর কিন্তু বাবার দায়িত্ব শেষ হয় না। বাবা আরো বেশ কিছুদিন বাচ্চাদের সঙ্গেই কাটায়। বাচ্চারা ভয় পেলে দায়িত্বশীল বাবার মতো আবার ঠাঁই দেয় পেটের মধ্যে। সি-হর্সদের প্রায় পঁয়ত্রিশ প্রজাতি এভাবেই সফলভাবে বাচ্চাদের বড় করে। আমাদের গঙ্গার একটা মিষ্টি জলের মাছও কিন্তু এই ব্যাপারের সি-হর্সদের অনুগামী। রেনবো-বেলি পাইপফিশ (*Microphis deocata*) পুরুষরাও কিন্তু একইরকম ভাবে গর্ভাবস্থা অর্জন করে এবং ব্রুড পাউচ থেকে কচিকাঁচাদের জন্ম দেয়।

বলোনা মা কি পেয়েছো আমায় কোলে পেয়ে :

এই প্রশ্ন করতেই পারে সেইসব মাছেরা, যারা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছানো পর্যন্ত মায়ের পেটেই থাকে। হাঙরদের অনেক সদস্যই সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। ভ্রূণ অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত বাচ্চার ক্রমবিকাশ ঘটে মা-হাঙরের জরায়ুর মধ্যে। জরায়ুর মধ্যেই মিউকাসের আবরণ প্রত্যেকটি ভ্রূণকে আলাদা খোপ দেয়, যার মধ্যে বিশেষ রকম প্লাসেন্টার (yolk-sac placenta) মাধ্যমে পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ করে মা-হাঙর।

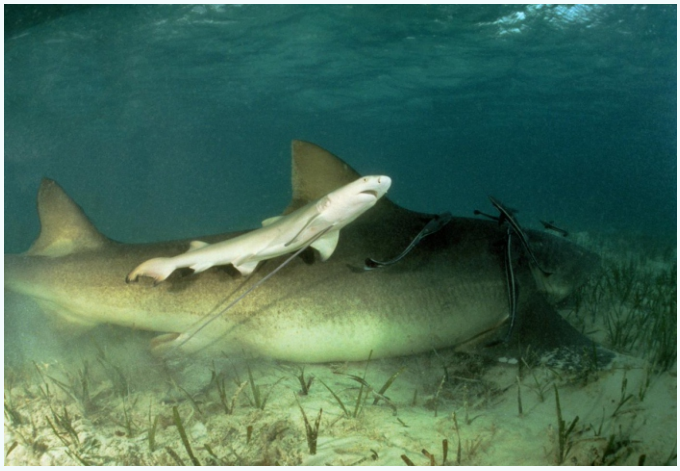

লেমন শার্কের সরাসরি বাচ্চা প্রসব

নার্স শার্কের (*Ginglymostoma* sp.) মতো কিছু প্রজাতির হাঙরের মায়েরা আবার ডিমটা না পেড়ে নিজের শরীরের মধ্যেই রেখে দেয়। ডিমের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে মায়ের শরীরের মধ্যেই, কিন্তু আগের ঘটনার মতো মায়ের সঙ্গে সেভাবে নাড়ির (প্লাসেন্টা) যোগ তৈরি হয় না। মায়ের পেটে ডিমের আবরণ কেটে বাচ্চা বার হলে মা-হাঙর পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে। তবে কিছু প্রজাতির হাঙরের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসেনা। তারা আগে উদরসাৎ করে মায়ের পেটে থাকা অনিষিক্ত ডিম্বাণুগুলোকে। কেউ কেউ তো মায়ের পেটেই দুর্বল ভাইবোনদের দিয়ে ফিস্টি সারে। তারপর ধীরে সুস্থে ভরপেটে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে পৃথিবীর আলো দেখে। বেশ গা-ছমছমে ব্যাপার কিন্তু!

এরসঙ্গে ওই মাছগুলোকে ভুলে গেলে চলবে না যারা দিন দিন অ্যাকোয়ারিয়াম

হবিতে অপাংক্তেয় হয়ে যাচ্ছে। মলি, গাপ্পি, সোর্ডটেল, প্লাটির মতো লাইভ-বেয়ারারদের কথা বলছি। ছোটবেলার মাছ পোষার স্মৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এরা। এদের পুরুষ মাছের পায়ু পাখনাটা স্ত্রী-দের থেকে অনেকটাই আলাদা, একটু লম্বা পাইপের মতো। এই বিশেষ গঠনের পায়ু পাখনা বা গোনোপোডিয়ামের মাধ্যমে এরা সরাসরি স্ত্রী-মাছের দেহের মধ্যে স্পার্ম চালান করতে পারে। মা লাইভ-বেয়ারারের দেহের মধ্যেই নিষিক্ত ডিমের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে এইক্ষেত্রে কোনো প্লাসেন্টা তৈরি হয় না, ভ্রূণ মুক্ত ভাবে মায়ের পেটের মধ্যে বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর মাছ পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়।

সিলাকান্থের (*Latimeria* sp.) মতো মাছের জগতের জীবন্ত ফসিলও কিন্তু লাইভবেয়ারার। স্ত্রী-সিলাকান্থ বছর কুড়ি বয়স হলে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং পুরুষ সঙ্গী তাদের পরিবর্তিত ক্লোয়াকার মাধ্যমে স্ত্রী-র দেহে শুক্রাণু চালান করে। দীর্ঘ গর্ভাবস্থা কাটিয়ে শুভ সময় দেখে মা-সিলাকান্থ পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়। এটাই এই ধরনের parental care এর সুবিধা। বাচ্চা জন্মের পর থেকেই নিজের ভালো বোঝে। নিজেরাই নিজেদের অন্নসংস্থান করতে পারে, বাবা-মায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। মা-লাইভবেয়ারারও বোধহয় ছেলেমেয়ের "বলোনা মা কি পেয়েছো?"-র উত্তরে প্রতিবার এই কথাগুলোই বলে।

পিতার বক্ষে জননী ক্রোড়ে, বাঁধিয়া রেখেছো স্বপন ডোরে....

মৎস্যকুলের অনেকে আবার ডিম বাঁচিয়ে, বাসা বানিয়েই ক্ষান্ত হয় না। সদ্যোজাত বাচ্চাদের রীতিমতো আদরযত্ন করে। অনেক মাউথ-ব্রুডার সিকলিড বহুদিন বাচ্চাদের আগলে রাখে। তারা নিজেরা ইচ্ছামতো ঘুরে ফিরে খাবার খেতে শিখে গেলেও সামান্যতম বিপদের আঁচ পেলেই অভ্যাসবশত মায়ের মুখের দিকে ছুটে যায়। মা কি আর ভালোবেসে মুখ না খুলে পারে? সি-হর্সের বাচ্চারাও যে বিপদ বুঝলে বাবার ব্রুড-পাউচে এসে ঢোকে সেও আগে বলেছি।

এবার বলি ডিসকাস মাছেদের বেশ অন্যরকম Parental care এর কথা। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বেসিনের ডিসকাস মাছেরা (*Symphysodon* sp.) যে সৌন্দর্যে মিষ্টি জলের যেকোনো মাছকে টেক্কা দিতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর অ্যাকোয়ারিয়াম হবির জগতে সিলেক্টিভ ব্রিডিং করে তৈরি করা নানারকম ভ্যারাইটির আকর্ষণ এড়ানোও ভীষণ মুশকিল। আক্ষরিক অর্থেই এরা মিষ্টি জলের মাছেদের রাজা। আর তারা যে ছানাপোনাদের যত্ন রাজকীয় ভাবে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি! জলে ডোবা কোনো কাঠ বা গাছের ডালে আঠালো ডিমগুলো পাড়ার পর ডিসকাস বাবা-মা সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকে। বাচ্চা ডিম ফুটে বেরোনোর প্রথম দু-তিন দিন ডিমের কুসুমের অবশিষ্ট অংশের খাবারেই কাজ চালায়। তারপর হামলে পড়ে বাবা-মায়ের গায়ে। খুঁটে খায় বাবা-মায়ের গায়ের মিউকাস আবরণ। কর্তা-গিন্নিও দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো পর্যায়ক্রমিকভাবে নিজের গা-ঠোকরাতে দেয় বাচ্চাদের। এরকম চলতে থাকে সপ্তা চারেক, এই পর্যায়ে বাচ্চাদের একমাত্র খাবারের উৎস বাবা-মায়ের মিউকাস। যদিও সপ্তা তিনেক পর এই মিউকাসের পুষ্টিগুণ কমতে থাকে। বাবা-মাও এবার বিরক্তি প্রকাশ করে বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেয়, এবার বাছা খেটে খাও। কিন্তু গল্পটা শুধুই পেট ভরানোর নয়, ডিসকাস বাচ্চারা বাবা-মায়ের থেকে পাওয়া এই প্রথম খাবারের মাধ্যমেই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা পায়। দেখা যায় বাবা-মায়ের থেকে আলাদা করে, অন্য খাবার খাইয়ে বড় করা ডিসকাসদের তুলনায় এদের সারভাইভাল রেট অনেকটা বেশি। তবে শুধু ডিসকাসই না আরো বেশ কিছু মাছ এরকম ভাবে সদ্যোজাত বাচ্চাদের নিজের শরীরের মিউকাস আবরণ খাইয়ে থাকে। যাদের মধ্যে আমাদের দাক্ষিণাত্যের ক্রোমাইড সিকলিডরাও (*Etroplus* sp.) আছে।

তবে এই সূত্রে আমাদের গ্রাম-বাংলার একটা মিঠে জলের দৈত্যের কথা না বলে পারছি না। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ভরা বর্ষায় কোনো পুকুরে যদি শালমাছ (*Channa marulius*) 'বাচ্চা চরায়' তবে সেখানে নামার কথা ভাবাও উচিত নয়। পরবর্তীকালে দেখেছি দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই বংশপরম্পরায় এই জনশ্রুতি প্রচলিত। শালমাছ কর্তা-গিন্নি এই সময় অত্যন্ত তিরিক্ষি মেজাজে কয়েকশো লাল টুকটুকে ছানাপোনাকে ঘিরে পাহারা দেয়। বাচ্চার ঝাঁক কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুরতে থাকে জলের উপরিভাগে আর তাদের ঘিরে গোল করে চক্কর মারতে থাকে প্রমাণ সাইজের বাবা-মা। এরা এইসময় একটাই জিনিস বোঝে পান থেকে চুন খসলেই আক্রমণ। বাচ্চা চরানো শালমাছ মানুষকে তেড়ে এসে কামড়েছে এই গল্প মাঝেমধ্যেই শোনা যায়।

ডিসকাস বাচ্চারা খুঁটে খাচ্ছে অভিভাবকের শরীরের মিউকাস আবরণ

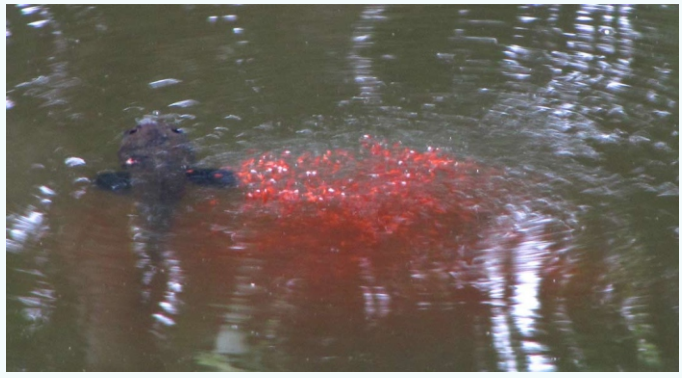

বাচ্চা চরানো শাল মাছ

এই গেল তাহলে মাছের অভিভাবকত্বের গল্প। হয়তো না-বলা থেকে গেল অনেকের কথা কিন্তু যেটুকু বলার সুযোগ পেলাম তাতে যদি একজনও মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামকে ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসেবে না দেখে, মাছকে নিজের পছন্দের পরিবেশ দিয়ে তাদের হাবভাব চালচলন লক্ষ্য করে তবেই এই লেখার সার্থকতা। এখনো বহু দেশীয় মাছ প্রজনন ঋতুতে কেমন হাবভাব দেখায়, কিভাবে তারা প্রেম নিবেদন করে, বাচ্চা-কাচ্চাদের যত্নআত্তি করে কিনা সে বিষয়ে আমাদের হাতে বিশদ তথ্য নেই। কে বলতে পারে একদিন আপনার পর্যবেক্ষণ থেকেই হয়তো গভীর জল থেকে মাছেদের সংসারের লুকোনো গল্পগুলো উঠে আসবে না!

ছবি : ইন্টারনেট ও লেখক

।। ফিশ ফাঁস।।

সঞ্জীব সাহা

খুঁজতে খুঁজতে বাজারের এগলি-সেগলি ঢুঁ মেরে দু-একটা দোকানে যা কিছু বিলের ছোট মাছ পেলেন মধ্যবিত্ত বাঙালিবাবু, দাম শুনে কানের বারান্দা উড়ে যায় আর কি! কিছুদিন বাদে দেশী পাঁকাল বোধহয় ক্যারেটে বিকোবে! হা-হুতাশ করতে করতে অগত্যা ব্যাগে ফেললেন আড়াইশো গ্রাম 'দেশী তিলাপিয়া'। আর লেজের দিকের একখণ্ড 'রূপচাঁদা', দুটোই একেবারে টাটকা, টকটকে লাল কানকো। রোজ ওই এক চালানি রুই-কাতলা কার বা ভালো লাগে? এদিকে মনে ভয় তাড়া করে— কে আবার ফর্মালিন মারছে। কে জানে! প্রায় একই চিত্র আজ গোটা দেশের প্রায় সকল আমিষভোজী মানুষের রোজকার। আমরা আস্তে আস্তে ভুলে যেতে বসেছি আমাদের প্রিয় দেশী মাছগুলো, আর সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে বিদেশী নতুন নতুন সব মাছ। দুঃখ সুখমিশিয়ে বছরে এক-আধদিন মৌরলার ঝোল জুটলে আমরা ভাবি লটারি পেলাম! বাড়ির কেউ অসুস্থ হলেও আজ শিঙ্গি-মাগুরের কথা মনে করার সাহস করি না!

যাকগে! মূল প্রসঙ্গে আসি।

অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল দেখে আমার যা মনে হয়েছে, নিজের মতো করে তার একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পাঠকের কাছে অনুরোধ, গোটা বিষয়টা একটু ধৈর্য্য সহকারে পড়বেন এবং আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করবেন।

চারিদিকে মাছের নানা দুর্দশা দেখে অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে একটা চোরা আতঙ্ক তো চলছিলই আর ঘেঁটে-ঘুটে যা দেখলাম তা সত্যি ভয় ধরানোর। এ ক্ষতি কোনোদিন আর পূরণ হওয়া সম্ভব না! তবে সবাই মিলে চেষ্টা করলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে, একটা পথ অন্তত বেরোবে এটা বিশ্বাস করাই যায়।

দূষণের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা হাতে গোনা কিছু 'ঝকঝকে' সমস্যার কথা তুলে ধরি। যেমন— প্লাস্টিকের ব্যবহার, কারখানার ধোঁয়া, অরণ্য ধ্বংস, চাষে কীটনাশকের ব্যবহার, জল অপচয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এসব প্রতিকারের জন্য রয়েছে নানা সরকারি /বেসরকারি নির্দেশিকা। তার কিছু নীতি কোথাও মেনে চলা হয় আর কোথাও নিয়ম নিয়মের খাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এ নিয়ে নানা রাজনীতিও চলে আসছে। আর শিকার হতে হচ্ছে প্রকৃতি এবং সমগ্র জীবকুলকে।

এই চোখে পড়া সমস্যাগুলোর মতো আরো কিছু ভয়াবহ বিষয় আছে যা সাধারণত আমাদের নজর এড়িয়ে রয়ে যায়। যেগুলোর প্রতিকার নিয়ে কারো বিশেষ মাথা-ব্যথাও নেই, যে বিষয়গুলো আসলেই খুব সূক্ষ্ম এবং বিতর্কিত। কিন্তু তা যে আমাদের এক ভয়ংকর বিপদের দিকে গুণিতক হারে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সমাজের বিভিন্ন মহলের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি এ বিষয়ে সরকারি পদক্ষেপও অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়।

ছবিতে যে মাছগুলো দেওয়া আছে, কমবেশি সবাই তাদের চেনেন। এরা প্রত্যেকেই বহিরাগত (exotic), উপকারের দোহাই দিয়ে একদিন উপমহাদেশে এদের আগমন ঘটানো হয়।

সময়টা ১৮৭০ থেকে ১৯৪৭ সাল, ভারতবর্ষে তখন এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় না ছিল ব্রিটিশদের, না ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বা বিজ্ঞানীদের। এক এক করে তখন ন'টা বিদেশী প্রজাতির মাছ উপমহাদেশে ঢুকে গেল! আর পিছু পিছু নাম উঠে গেল আরো আটের, যাদের আগমন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ঘটে।

একে একে নিয়ে আসা হল ইউরেশিয়ার মিষ্টি জলের টেঞ্চ ফিশ (*Tinca tinca*); উত্তর ইউরোপের ক্রুসিয়ান কার্প (*Carassius carassius*); ইউরোপিয়ান কমন কার্প, এমনকি ব্রাউন ট্রাউট এবং রেইনবো ট্রাউট পর্যন্ত! ওই সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রথম আসে জায়ান্ট গোরামি (*Osphronemus goramy*), সহজ ভাবে বললে— খোলসে মাছের বিগ ব্রাদার আর কি! মশা তাড়াবার অজুহাতে ঢুকে গেল সুদূর মেক্সিকো উপকূলের গ্যাম্বুসিয়া (*Gambusia affinis*); আর তারপর রং বাহারি গাপ্পি (*Lebistes reticulatus*); যার আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব এলাকা।

ক্রুসিয়ান কার্প (*Carassius carassius*)

গ্যাম্বুসিয়া (*Gambusia affinis*)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে (১৯৩৯), আচমকা মিরর কার্পের জার্মান প্রজাতির পোনা শ্রীলঙ্কা থেকে ধরে এনে উটি লেকে ছাড়া হল এবং নীলগিরির জলে তারা বেশ বহাল তবিয়তে টিকে রইলো। ১৯৪৬-এ এই প্রজাতিকে উত্তরাখণ্ডের ভওয়ালি হ্যাচারিতে আনা হয় এবং পরবর্তীতে এখান থেকে কুমায়ুন এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন লেকেও ছাড়া হয়। ডাল লেকে এদের

দাপটে অনেক স্থানীয় মাছের জীবন সংশয় শুরু হয়ে যায়, এমনকি এদের জন্য বিশেষ একটা-দুটো প্রজাতির স্নো-ট্রাউট (*Schizothorax* sp.) আমরা সম্পূর্ণ হারিয়েছি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। একটা সময় পরে দেখা গেল মিরর কার্পের জার্মান প্রজাতিটি উপমহাদেশের জলবায়ুতে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করছে না। ফলে এই 'ব্যর্থতাকে' ঢাকতে ১৯৫৭-র আগস্টে ব্যাংকক থেকে কটকে আঁশযুক্ত কমন কার্পের চাইনিজ প্রজাতিটি নিয়ে আসা হল, বাজারে তাকালেই যাকে আজ দেখা যায়।

ধীরে ধীরে সরকারি সাহায্যে মাছ চাষীদের কমন কার্প চাষে উৎসাহিত করা চলতে থাকে, ফলে দ্রুত সারা দেশের চাষযোগ্য জলাশয়ে এ মাছ বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে বন্যা ও অন্যান্য কারণে বদ্ধ জলাশয় থেকে বেরিয়ে প্রাকৃতিক জলাশয় তাদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। তলাবাসী মাছ হওয়ার কারণে এসব জলাশয়ে তারা মৃগেল, মাগুর বা গলদা চিংড়ির খাদ্য আর জায়গা দখল করা শুরু করে এবং দীর্ঘকাল এভাবে চলার ফল স্বরূপ ওইসব দেশী মাছের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়।

১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর হাত ধরে অনেক মাছ এদেশে ঢুকে যায়, যে ধারাবাহিকতা আজও থেমে যায়নি! ১৯৫৯ সালে গ্রাস কার্পকে (*Ctenopharyngodon idella*) আনা হয়। যাদের আদি নিবাস উত্তর ভিয়েতনাম থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত। ওই একই বছরে আসে সিলভার কার্পও (*Hypophthalmichthys molitrix*), তারাও মূলত পূর্ব সাইবেরিয়া এবং চীনের বাসিন্দা। যদিও সিলভার কার্পকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত নাকি শুধু কিছু পুকুরেই রাখা হয়েছিল। রেকর্ড অনুযায়ী সে বছর আরো ২৩৯ টা নতুন সিলভার পোনা এনে Kulgarhi Reservoir-এ ছাড়া হয়েছিল।

গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngodon idella*)

আসলে আগে যখন পরিবেশ নিয়ে মানুষের ভ্রু কুঁচকানোর সময় আসেনি, বলা যায়— এসব ভাবার কথা মাথাতেও আসতো না, তখন কিছু ক্ষেত্রে ছোটখাটো পরিকল্পনা মাথায় নিয়েও এক দেশের মাছ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমনটা হয়েছিল উত্তর আমেরিকায়, ১৯৭০ সালে সেখানে বিভিন্ন জলাশয়ের শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি জল শোধনের কাজে সিলভার কার্প এনে ছাড়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা, বেশ কিছু সিলভার কার্প প্রকল্পভুক্ত জলাশয় থেকে পালিয়ে প্রাকৃতিক জলাশয়ে গিয়ে ওঠে। এমন সব দুর্ঘটনার ফলে আজ সেদেশে সিলভার কার্পের নাম চরম হানিকর প্রজাতির তালিকায় রাখা হয়েছে। এদিকে আমাদের দেশে সিলভার কার্পের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি ভাবে ঢুকে যায় বিগহেড কার্প, এরা সিলভারের থেকে আরো বেশি ধ্বংসাত্মক।

আমাদের দেশে গ্রাস কার্পের আগমনও অনেকটা একইভাবে... জলের বিভিন্ন প্রজাতির পানা, শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই প্রথম গ্রাস কার্পকে 'আদর্শ' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। হওয়ার সুবাদে কৃষিক্ষেত্রে খুব গ্রহণযোগ্য মাছ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। তবে কিছুদিন বাদে খেয়াল করা হয়— এরা *Hydrilla verticillata* নামের একটা বিশেষ জলজ উদ্ভিদকেই প্রাথমিক আহার হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এই ছোট্ট বিষয়টা প্রথমে কেউ তেমন পাত্তা না দিলেও কিছু দিনের মধ্যে তা গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। একদিকে গ্রাস কার্পের দৈহিক ওজনের প্রায় সমপরিমাণ খাদ্য রোজ প্রয়োজন হয়। অথচ, রাশি রাশি কচুরিপানা, ফুলপানার মতো জলজ আগাছা তারা ছুঁয়েও দেখছে না! দেখা গেছে এরা যে পরিবেশে ঢোকে, তার বাস্তুতন্ত্র ভেঙে চুরমার হতে বেশি সময় লাগে না। যেমন ধরুন, ল্যাটা বা শোলের মতো শিকারির হাত থেকে বাঁচতে চিংড়ি বা অন্য ছোট মাছেরা পাতা বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। সেই গাছগুলো খেয়ে শিকার-শিকারির এই লড়াই পুরো মাঠে মেরে দেয় গ্রাস কার্প! ফলে প্রাথমিকভাবে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে শিকার-শিকারি উভয়েরই।

এরপর এদেশে আসে সিলভার বার্ব (*Puntius gonionotus*)– আমরা যাকে চায়না/জাপানি/থাই পুঁটি বলে বাজারে দেখি। বাংলা নামের সঙ্গে চীন/জাপান যুক্ত হল কীভাবে, সে গল্প এখনো আমার অধরা! এদের বসতি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, সুমাত্রা, জাভা, মালয়েশিয়া, বোর্নিও এবং থাইল্যান্ডে বা মূলত মেকং অববাহিকা এবং ডং নাই (Dong Nai) নদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্রুত বৃদ্ধির কারণে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তবে বড় কার্পের সঙ্গে এদের চাষ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, রুই মাছের বৃদ্ধি কমে গেছে এবং তার উৎপাদনে প্রভাব ফেলছে।

জাপানি পুঁটি (*Puntius gonionotus*)

বাজারে বিক্রেতা অনেক সময় ব্যবসায়িক স্বার্থে কোনো মাছের ভুল/বিকৃত নাম প্রচার করে থাকেন... 'দেশী ত্যালাপিয়া' নামটা তার অন্যতম। তিলাপিয়া যে আমাদের দেশের মাছই না, সে খবর আর ক'জন রাখেন! আসলে ১৯৫২ সালে সরকারি উদ্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিক তিলাপিয়া (*Oreochromis mossambicus*) নামে এক রাক্ষসকে ধরে এদেশে এনে চাষে প্রসার ঘটানোর বাণী আউড়ানো হয়! এর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েক বছর বাদে বেআইনি ভাবে নাইলোটিকা (*Oreochromis niloticus*) নামে এর আরেক জাত ভাইকে টেনে আনা হয়। আর তখন থেকে মোসাম্বিকের নাম হয়ে যায় 'দেশী'! এতে তার কদর বেড়ে যায় ঠিকই, তবে বাজার দখলে নাইলোটিকা অনেক এগিয়ে যায়। অস্বাভাবিক দ্রুত বংশবৃদ্ধির ফলে আজ ভারতের যেকোন জলাশয়ে তিলাপিয়ার কোনো না কোনো প্রজাতি আপনি খুঁজে পাবেন। সম্প্রতি বেআইনি ভাবে রেড তিলাপিয়া নামে এদের আরেক ভাইকে নিয়ে কালোবাজারি চলছে, অনেক খামারে তার চাষও হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

মোজাম্বিক তিলাপিয়া (*Oreochromis mossambicus*)

নাইল তিলাপিয়া (*Oreochromis niloticus*)

ধ্বংসলীলার শুরুর দিকে সমগ্র এলাকা জুড়ে বিভিন্ন হ্রদ ও নদীতে তিন-চার রকম বিদেশী ট্রাউট মাছ ছাড়া হয়। বর্তমানে উত্তরাঞ্চল, জম্মু-কাশ্মীর এবং হিমাচলের প্রায় সমস্ত লেকে নিয়মিত ভাবে ব্রাউন ট্রাউট (*Salmo truttafario*) আর রেইনবো ট্রাউট (*Oncorhynchus mykiss*) ছাড়া হয়। এমন অপরিকল্পিত কাজের মূল্য আমাদের শেষ অবধি কীভাবে মেটাতে হবে বলা শক্ত! প্রকৃতির সঙ্গে এই লাগামছাড়া খামখেয়ালিপনা আর অত্যাচারের ফল নিশ্চই আমরা এখন অল্প অল্প বুঝতে পারছি। এক্ষুণি সাবধান না হলে কিছুদিন বাদে যে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লিস্ট কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বিদেশী মাছের সংখ্যা আজ আর বলে শেষ করা মুশকিল। এবার আসি প্রায় সবার পরিচিত ব্ল্যাক কার্প (*Mylopharyngodon piceus*) প্রসঙ্গে। গেঁড়ি, গুগলি, শামুক নিয়ন্ত্রণ করতে এরা উপমহাদেশে আসে। অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধির কারণে চাষীর কাছে খুব আকর্ষণীয় মাছ হয়ে ওঠে এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি, আজকাল মাছ চাষীরা ব্ল্যাক কার্প ছাড়া চাষের কথা ভাবতেই পারেন না! জলাশয়ে এদেরকে জায়গা দিতে চাষী তাই কালবোস (*Labeo calbasu*) আর দেশী পাঙ্গাসকে (*Pangasius pangasius*) বাদ দিয়েছেন। এদেশে আগমনের কয়েক বছর বাদে দেখা গেল কিছু ব্ল্যাক কার্পনিয়মিত হারে গাফিলতি বা দুর্ঘটনার কারণে খাল-বিলে ঢুকছেই। আজ গ্রামে একজন সাধারণ হাঁস পালককে শামুক খুঁজতে কত কষ্ট করতে হয়, সে তিনিই ভালো বলতে পারবেন। 'ব্ল্যাক হোলে' সব শামুক গায়েব!

ব্ল্যাক কার্প (*Mylopharyngodon piceus*)

নব্বইয়ের দশকে বেআইনি ভাবে বাংলাদেশের কিছু হ্যাচারি থেকে প্রথম থাই পাঙ্গাস (*Pangasius sutchi*) নিয়ে আসা হয়, বাংলাদেশে যা আনা হয়েছিল থাইল্যান্ড থেকে। নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও লাভজনক মাছ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে যা রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে প্রাকৃতিক

থাই পাঙ্গাস (*Pangasius sutchi*)

জলাশয় নিধনে এদের ভূমিকার প্রচুর নমুনা পাওয়া যায়, যা নিয়ে এখনো প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে মাছ বাজারে আপনি কিছু না পেলেও পাঙ্গাস পাবেন, যার সবই ওই থাই! দেশী সেই হলুদ আর লালচে আভা যুক্ত পাঙ্গাসটা আপনার স্মৃতির পাতায় চলে গেছে। এইসব বহিরাগত মাছের সাথে ছয়-সাতটা বিদেশী ব্যাকটেরিয়াও নাকি আমাদের দেশের জলাশয়ে পাওয়া গেছে।

শহর থেকে একটু দূরে গ্রামে-গঞ্জে গেলেই আমরা দেখতে পাই শয়ে শয়ে জলাশয়, সেখানে সবাই কম-বেশি মাছ উৎপাদন করছেন, যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায় যে কি কি মাছ চাষ হচ্ছে। তাতে উপরের মাছগুলো ছাড়াও নিষিদ্ধ আরো কিছু মাছের নাম উঠে আসে। এই যেমন- হাইব্রিড/আফ্রিকান মাগুর, থাই কই, রূপচাঁদা(পাকু), থাই শোল, থাই গোরামি ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু কথাবার্তায় সহজে বোঝা যায় যে বেশীরভাগ চাষীর ধারণাই নেই কোন মাছটা বেআইনি বা কেন তা বেআইনি। হয়তো তাঁর জানার ইচ্ছে বা প্রয়োজন কোনোটাই হয় না, তাঁকে যা খাওয়ানো হয়, তিনি তাই গিলে চলেন!

হাইব্রিড/আফ্রিকান মাগুর (*Clarias gariepinus*)

রূপচাঁদা (*Colossoma macropomum*)

শৌখিন বিদেশী মাছ যারা অ্যাকোয়ারিয়ামে পালন করেন, তাদের মধ্যে অনেকে আবার নিয়ম নীতির ধার ধারেন না। শুধুমাত্র বদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখার অনুমতি আছে যেসব মাছের, তেমন কোনো একটা মাছ বড় হওয়ার পর জায়গা দিতে না পেরে নির্বোধের মতো তারা আশেপাশের বড় জলাশয়ে ছেড়ে দিয়ে আসেন! তা সে এলিগেটর গার, পিরানহা, আমাজনের ক্যাট ফিশ, এমনকি আরাপাইমা যাই হোক না কেন! এমন ক্ষেত্রে সেই শখের মাছকে কষ্ট করে মেরে ফেলাই অনেকাংশে সঠিক পথ। আর যদি কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগে তো ভালো কথা।

বিদেশী কার্পগুলোকে চাষীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কিছু প্রলোভন দেখিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে। তাঁদের বোঝানো হয়েছে— কার্পজাতীয় মাছ অন্য মাছ গিলে খায় না, তাই ক্ষতি কিসের! অন্যদিকে তাদের যা কিছু বোঝানো হয়নি, সে ক্ষতির কথা অদ্ভুতভাবে চিরকাল অদৃশ্যই থেকে গেছে! তার মনে এই ধারণার জন্ম দেওয়া হয় না যে কেন তিনি আজ বিলে বা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায় রোজই খালি হাতে ফেরেন। আর যাঁরা প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন, তাঁদের পক্ষে জনে জনে এ গল্প বোঝানো। সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর জন্য গা ছাড়া দেওয়া সরকারি নীতি, প্রশাসন আর কিছু সুবিধাবাদী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

এতগুলো মাছের ইতিহাস নিয়ে গল্প বলার একটাই উদ্দেশ্য— বিদেশী মাছের থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথের সন্ধান করা। কারণ প্রকৃতিকে বাঁচাতে গেলে জল থেকে আমাদের ভাবা শুরু করতে হবে, তার ভেঙে পড়া বাস্তুতন্ত্রের মেরামত করার রাস্তা বের করতেই হবে।

আমার মনে হয়,

সবার আগে মৎস্য আমদানি-রপ্তানির আইন সম্পূর্ণ শোধন করা প্রয়োজন। বিরাট অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নিয়মগুলো রাতারাতি কোনো পরিবর্তন করা বাস্তবে সম্ভব নয় ধরে নিয়ে ৫-৭ বছরের একটা পরিপূরক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত সরকারি দপ্তর থেকে।

যে বহিরাগত মাছেরা অনেকদিন ধরে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, তাদের বিকল্প। হিসাবে যে সব দেশী মাছ জায়গা পেতে পারে বলে ধরা যায়, সেসব মাছের উপর গবেষণাধর্মী কাজ, কৃত্রিম উৎপাদন এবং সেই প্রজাতিকে চাষের জন্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ মৎস্য দপ্তরকে অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে পালন করতে হবে।

হ্যাচারিতে বিদেশী মাছের প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেই হবে। অন্যদিকে সেই হ্যাচারিতে দেশী মাছের পোনা উৎপাদনে উৎসাহিত করতে আর্থিক সাহায্য করতে হবে সরকারকে।

শুধুমাত্র দেশী মাছের চাষ করলে চাষীকে বছরে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয়ে টিকে থাকা বিদেশী মাছ ধরা পড়লে তাকে আটক করতে হবে, গবেষণার কাজে তাদের সাময়িক বদ্ধ জলাশয়ে রাখা যেতে পারে বটে। তবে নিধন করে বাজারজাত করাই সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে হয়। সরকারি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রগুলো থেকে সারা দেশে নিয়ম করে বিলুপ্তির পথে পা বাড়ানো স্থানীয় মাছের পোনা প্রকৃতিতে উন্মুক্ত করতে পারলে ক্ষতিপূরণ হওয়া কিছুটা শুরু হবে হয়তো।

অন্যদিকে রঙিন মাছের জন্য তৈরি আইনকে সংশোধন এবং অত্যন্ত কঠোর হতে পালন করতে হবে, যাতে ফিশট্যাঙ্ক থেকে একটা মাছও প্রকৃতিতে যাওয়ার পথ না পায়।

আমার বিশ্বাস, সবাই মিলে এবিষয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আরো অনেক অনেক পথ বেরোবে। আশাকরি আর কারো দ্বিমত থাকার কথা নয় যে বহিরাগত মাছেরা আমাদের দেশের জন্য। সার্বিকভাবেই ক্ষতিকর, একইভাবে আমাদের প্রজাতিরা বিদেশের জন্য। এদের হাতে ইতিমধ্যেই এক বিরাট ক্ষতির পাহাড় রচনা হয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের ভাবা দরকার— একইভাবে চলতে দেওয়া। উচিত হচ্ছে কি না? সবার মাথায় রাখা উচিত— জলাশয়গুলো একবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মনুষ্য জাতির বিপদ আটকানোর কোন পথ আর খোলা থাকবে না।

একটা মাছকে আইনসিদ্ধ করতে বা বেআইনি চাষের রাস্তা পাকা করতে এক বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন জড়িয়ে যায়। নতুন একটা মাছ পালনের নিয়ম-নীতি, খাবার-দাবার, ওষুধ-পত্র সব কিছুর পিছনেই কোটি কোটি টাকার ব্যবসা লুকিয়ে থাকে। তাই নতুন কোনো পদক্ষেপের কথা শুনলে আজকাল এই পুরো ব্যবস্থাকে খুব সন্দেহ হয়!

অন্যদিকে, আশার আলো এই যে— এত কিছুর পরেও কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষ এই প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে প্রকৃতিকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো তাঁদেরই দৌলতে ভবিষ্যতে দেশী পুঁটি, খোলসে, চাঁদা, মৌরলা, পাঁকাল, বেলে ইত্যাদির আর কোনো অভাব থাকবে না। আমরা হয়তো আবার একটা স্বর্ণযুগে পা রাখার সুযোগ পাবো। সেই আশায় দিন গোনা ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

ছবি : ইন্টারনেট, জিন ট্রেসফন ও লেখক

তথ্যসূত্র : Wikipedia, Fishbase, Google.

মাছ চিত্র

কুমীর মাছের কবলে

গল্প ও ছবি: অরিত্র ভট্টাচার্য্য
অলঙ্করণ: শ্রীদীপ্ত মান্না

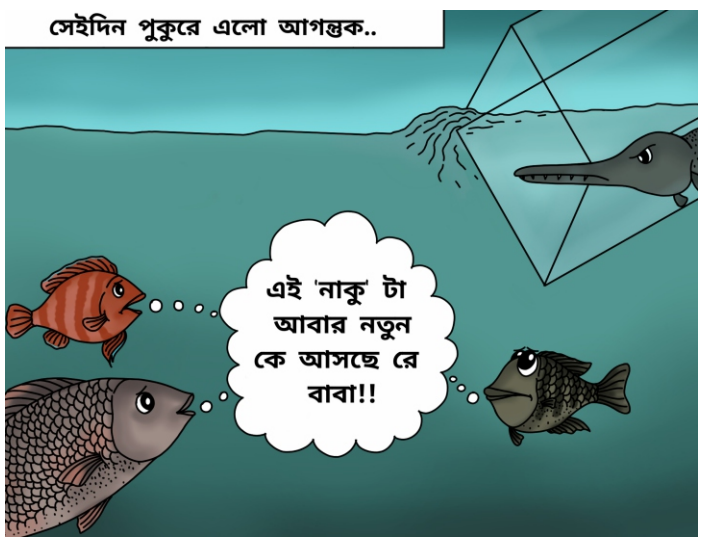

কুমীর মাছের কবলে

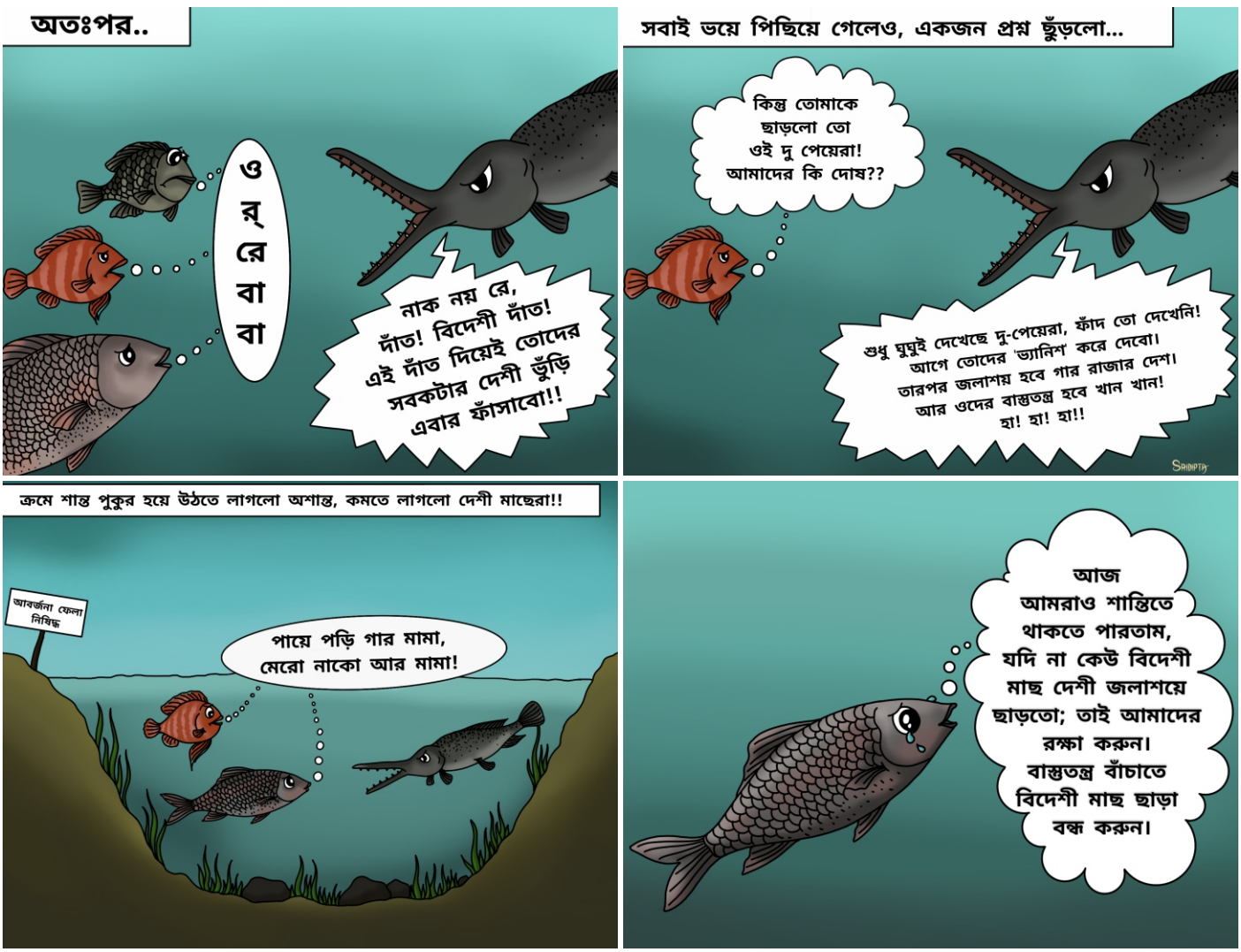

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

House of exclusive boutique garments for women and men

For booking and other query
kindly call or whatsapp @ 9830542465

Navya
LIVE WITH TRADITION

Royal Aquarium Express

Aquatic Solutions For All

Sub-Distributor (District - Nadia)

NATURE ALLELES

WA

LOCATION : RANAGHAT, DIST- NADIA, WEST BENGAL

9064817611 , 7602745202 , 7076310053

Fireglow
Aquarium Lighting Solution
MADE IN INDIA

TOO GOOD FOR YOUR FISH

REMORA

Best Seller & First Choice of Hobbyist

NUTRINA

Betta & Guppy Feed

NATURE ALLELES

WA Volcano Mineral Soil

WA Root Bacteria Free with 5 Lt. Pack

2 Lt. Pack

5 Lt. Pack

For Trade Enquiry Contact us.

AQUATIC REMEDIES™

We deal with all types of Aquarium / Aquatic Related Products & Accessories in Wholesale & Retail in Nadia District. For Trade & Business Enquiry Contact us.

Email : royalaquariumexpress@gmail.com , Website : www.royalaquariumexpress.in

জঙ্গলমহলের কুড়মি জনজাতির মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি

রাকেশ সিংহ দেব

ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গভূমির (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) অন্তর্গত ছোটনাগপুর (মতান্তরে 'চুটিয়া নাগপুর') মালভূমির জঙ্গলাকীর্ণ জমিদারি এলাকা বা 'মহাল' স্থানীয়ভাবে উচ্চারিত হয়ে নাম নিয়েছে 'জঙ্গলমহল'। এই নামটি নিয়ে অনেকের মধ্যে অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হলেও মনে রাখতে হবে, জঙ্গলমহলের মানুষ জংলি নয়, এখানকার মানুষজন প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির সন্তান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনধারার চর্চার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিমুখী। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে রয়েছে শিকড়ের টান, মননে রয়েছে পরম্পরায় চলে আসা এক অভিন্ন সংস্কৃতির প্রবাহ। বিশ্বায়নের যুগেও নিজের অস্তিত্বকে নতুন করে চিনে নেওয়ার প্রচেষ্টা। জঙ্গলমহল এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সিংহভাগ হল বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বেশিরভাগ টোটেমিক আদিবাসী। এই টোটেমিক আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রয়েছে। একাধিক গোষ্ঠী। টোটেম হল সেই প্রতীক যা দিয়ে টোটেমিক আদিবাসীদের গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট প্রতীক বা টোটেমগুলি তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। Oxford Advanced Learner's Dictionary এর মতে টোটেম-এর অর্থ "A natural object or animal that is believed by a particular society to have spiritual significance and that is adopted by it as an emblem." টোটেম কুলচিহ্ন। টোটেম কেবল নিরীহ বা হিংস্র জীবজন্তুই নয়, উদ্ভিদ থেকে বিশাল বৃক্ষ পর্যন্ত টোটেম হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায়। এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি মাছেরাও।

জঙ্গলমহলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ হল কুড়মি সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের আচার সংস্কার, জীবনযাপনের মধ্যে আজও পরম্পরাগত উপজাতির অধিকাংশ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন টোটেম ও ট্যাবু কুড়মি জাতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যা তাদের আদিম আরণ্যক সত্তার প্রমাণ দেয়। জঙ্গলমহলের লোকসাহিত্য এবং লোকজীবন বিশ্লেষণে 'লোক' বলতে আমরা যাদের বুঝি তাদের মুখ্য অংশ হল এই কুড়মি জনজাতি। লোকসংস্কৃতি গবেষকগণ একথা স্বীকার করে বলেছেন—

"এদের বাদ দিলে সীমান্ত বাংলাও থাকে না, সীমান্ত সংস্কৃতিও থাকে না।"

কুড়মিদের মোট ৮১টি গোষ্ঠীর বিভিন্ন টোটেমের মধ্যে পশু পাখি ও প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে মাছ এবং মাছ ধরার ব্যাপার।

হিঁদউআর	কুচিয়া মাছ	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।
জাল বানুআর	মাছ ধরার জাল	জাল বোনা ও ব্যবহার নিষেধ।

১. টোটেমিক কুড়মি জনজাতির বিভিন্ন নেগাচারে বিভিন্ন দেশি মাছের ব্যবহার ও উপস্থিতি স্পষ্ট চোখে পড়ে। কুড়মিদের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু ঘিরে আবর্তিত হয় মাছ। কুড়মি জনজাতির মধ্যে সন্তান জন্মলাভের পর একুশার দিন স্নান করিয়ে সেই শিশুকে মাছ ধরার পাটা বা সিয়াআড়ার উপর শোয়ানো হয়। এতে বাচ্চার স্নায়ুরোগ (চলতি কথায় 'রস তড়কা') হয় না বলে বিশ্বাস। এরপর শিশুর তিনমাস বয়সকালে এক নেগাচার পালনের সময় শিশুর পেটের উপর জ্যান্ত প্যাঁকাল মাছ (*Macrognathus aculeutus*) ছাড়া হয়। লোকবিশ্বাস এতে শিশুর পেটের রোগ দূর হয় এবং পরবর্তী সময়ে পেটে মেদ জমে না। এই নেগাচার পালনের পরেই শিশুর মা প্রসবের পরে প্রথমবার মাছ খেতে পারে।

কুড়মি বিয়েতে অন্যতম প্রধান উপকরণ হল চ্যাং মাছ (*Channa gachua*)। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ছেলের বাড়ির লোকেরা একটি জ্যান্ত চ্যাং মাছ ধরে এনে তা ছোট মাটির হাঁড়িতে জিইয়ে রাখে। কনের বাড়িতে যাওয়ার সময় বরের সঙ্গে বিভিন্ন উপহার ও তত্ত্বের সঙ্গে সেই মাছটিও যায়। বরের বাড়ির লোকজন তাদের বাড়ি থেকে আনা বিভিন্ন উপহার ও অলঙ্কার কনের মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করার সময় কনের কপালে সেই মাছের হাঁড়িটিও ছোঁওয়ানো হয়। এরপর সেই মাছের হাঁড়িটি বিবাহের জায়গায় (ছামড়াতল) একপাশে রাখা হয়। কনের বাড়ি থেকে এক ভাঁড় দই রাখা হয় সেই মাছের হাঁড়িটির পাশে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি আসার সময় কনে নিজের সঙ্গে সেই ভাঁড় দুটি

নিয়ে আসে। এরপর সেই চ্যাং মাছটিকে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতি গবেষক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা মৃণাল মাহাত এই নেগাচারের পেছনে থাকা সামাজিক এবং ধর্মীয় কারণ হিসেবে জানান, টোটেমিক আদিবাসী কুড়মি সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল পুরুষ এবং স্ত্রী (প্রকৃতি) এর মিলনের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টিচক্রের আবর্তনকে সচল রাখা। এখানে পুরুষ শিশ্ন সদৃশ মাথা বিশিষ্ট চ্যাং মাছকে ধরা হয় পুরুষাকারের প্রতীক এবং দুগ্ধজাত দই হল স্ত্রীধনের প্রতীক। চ্যাং মাছ এবং দই এর হাঁড়ি কনের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদের উদ্দেশ্য হল যাতে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবন সুখের হয় তার প্রার্থনা করা। নববধূ ভবিষ্যতে সুস্থ সবল সন্তানের জন্মদান করতে পারে এবং সদ্যজাতের মাতৃদুগ্ধ সহ পুষ্টির অভাব না হয়। কুড়মি জনজাতির মানুষ মারা গেলে সেই মৃত ব্যক্তির ঘাটকর্ম সারার পরে স্নান করে বাড়ি ফিরে আত্মীয় পরিজনদের মাছ ভাত খেতে হয়।

২. কার্তিক মাসে বাঁদনা পরবের সময় ধানজমি থেকে ঘুনি, পাটা-য় ধরে আনা ধানলুলি মাছ (*Danio rerio*) দিয়ে বাড়ির গৃহিণীরা সুস্বাদু পিঠা বানান। ঝাঁঙ্গড়ের দল আহিরা গান গেয়ে সারারাত গরু জাগানোর পরে গৃহস্থের বাড়ি মাগনে এলে তাদের পিঠা খেতে দেওয়া হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন অর্থাৎ 'বুড়হি বাঁদনা'-এর দিন দুপুরে গোয়াল ঘরে দাঁড় করিয়ে গরুর 'বাগাল'-দের (রাখাল) মাথায় গৃহকর্ত্রী সরষের তেল ঢালে। সেই তেল 'বাগালের মাথা থেকে পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।' এদিনের দ্বি-প্রহরিক খাবারে থাকে মাছভাত। লোকবিশ্বাস এটা গৃহস্থের স্বচ্ছলতার প্রতীক।

৩. জল-জমিন-জঙ্গল কেন্দ্রিক কুড়মি সহ বিভিন্ন হড়-মিতান জাতিগোষ্ঠীর কাছে পয়লা মাঘ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওই দিন 'আখাইন যাত্রা'। জঙ্গলমহলের কৃষি-সংস্কৃতিতে নতুন বছরের আরম্ভ। শুরু হয় নতুনভাবে কৃষিবর্ষের সূচনা। কৃষি-সংস্কৃতি মানেই গ্রামীণ সংস্কৃতি-যৌথ সংস্কৃতি। সেখানে ব্যক্তির মঙ্গল কামনা থেকে বড় হয়ে উঠে সমষ্টির মঙ্গল কামনা। এদিনেই, 'হড়-মিতান' কৃষি সংস্কৃতিতে নতুন বছরের জন্য নতুন 'গলাঘর' (মনিব ঘর) ঠিক করে নেয় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী। চুক্তিবদ্ধ হয় নতুন করে, নতুন বছরের জন্য। এই চুক্তিকে বলা হয় 'ভুইল্যা'। কৃষি-সংস্কৃতি হল যৌথ-সংস্কৃতি; পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি। বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক আদানপ্রদানই সেখানে বড়কথা। সেই গ্রামে যদি জেলে থাকে। তাহলে জেলেরা সম্পন্ন চাষির ঘরে মাছ দিয়ে যাবে। বিনিময়ে চাষিদের পুকুর ডোবায় সারাবছর মাছ চাষ করার সুযোগ পাবে।

৪. 'আইজ রে করম ঠাকুর ঘরে দুয়ারে।
কাইল রে করম ঠাকুর কাঁসাই লদীর পারে।।'

'করম' পরব জঙ্গলমহলের জনজাতি মানুষের সৃজন উৎসব। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের জনজাতি মানুষদেরও প্রাণের উৎসব। জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক জীবন ধারার প্রতিফলন। করম পরব তিথি নির্ভর। প্রতি বছর বাংলা সনের ভাদ্র মাসের একাদশী তিথি। শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি। তিথি মতে যার নাম 'পার্শ্ব-একাদশী। ওইদিন 'করম' ঠাকুরের পূজানুষ্ঠান। অবশ্য তার প্রস্তুতি শুরু হয় এক সপ্তাহ আগে থেকেই। করম পরবের মূল আকর্ষণ হল এই পরবে। গাওয়া 'জাওয়া গান'। করম পরব এর মূল হোতা কুমারী মেয়েরা। মূলত 'কুড়মি' জাতিগোষ্ঠীর কুমারী মেয়েরা ব্রতী হলেও বিভিন্ন 'হড়-মিতান' জনগোষ্ঠীর কুমারী মেয়েরাও সামিল হয়। ফলে জাওয়া গানগুলিতে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সহ সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। এই ধরনের গানগুলিই লোকসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। এই গানগুলিতেও জায়গা করে নিয়েছে জঙ্গলমহলের কুড়মি জনজাতির মৎস্য পরম্পরা।

"মাছে ঝিঙ্গায় রাঁইধে ছিলি ননদিনীর তরে লো—
হন বেলা খবর আইলঅ ননদি মইরেছে লো।।"

নারীমনের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আশা-নিরাশার ছবিই গানগুলির মূল আশ্রয়। এছাড়াও সমকালীন সমাজজীবনের নানাবিধ ঘটনাও জাওয়া-গানের বিষয় হয়ে ওঠে। কুমারী ব্রতীনীরা সমকালীন যে কোনও ঘটনার বিষয়কে নিয়ে চটজলদি মুখে মুখে গান রচনা করে।

'ইঁদ-পরব' হল 'করম-পরবে'-র শেষ পর্যায়। তাই করম পরবের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ। 'করম-পরব' তিথি নির্ভর। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথি, যার নাম 'পার্শ্ব একাদশী। এই দিন করম। তার পরের দিন পূজা। অর্থাৎ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে 'ইঁদ-পরব'। অরণ্যেঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য। জঙ্গলমহলের এইসব পূজা-পার্বণগুলোও বন-জঙ্গলের উপাদান ঘেঁষা। ইঁদ পূজার প্রধান উপকরণ 'ডাং' সংগৃহীত হয় জঙ্গল থেকেই। রাখি পূর্ণিমার দিন জঙ্গলের সেরা শাল গাছটিকে বেছে নেওয়া হয় ইঁদ-ডাং হিসাবে। শাল গাছটিকে হতে হবে নীরোগ, সোজা, লম্বা ও সরেস। একপক্ষ কাল আগেই। জঙ্গলের ভিতর থেকে সেই শাল গাছ কেটে আনা হয় ইঁদ-ট্যাঁড়ে। ছাড়ানো হয় ছাল, ছালহীন সমস্ত কাণ্ডে পরিমাপ করে পরানো হয় সাদা থান ইঁদ ডাণ্ডের ডগায় বাঁশের তৈরি একটা ছাতার কাঠামো বাঁধা হয়। ছাতাটিও নতুন থান কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ইঁদ-ট্যাঁড়ে ইঁদ থাপনে খোঁড়া হয় পরিমাপ মতো গর্ত। ইঁদ-ডাং তোলবার সময় গোড়ার দিকটা গর্তে ঢুকিয়ে সোজা করে বেঁধে দেওয়া হয় পাশাপাশি পুঁতে রাখা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে। উপস্থিত জনতা হাতে হাত লাগিয়ে দড়ি ধরে 'ইঁদ-ডাং' টেনে তুলতে সাহায্য করে। লোকবিশ্বাস, 'ইঁদ-ডাং' তোলা ও নামানোর মধ্যখানে যে সাতদিনের ব্যবধান; সেই সাত দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাত হবেই এবং বৃষ্টির জলে দড়ি পচে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। অর্থাৎ 'ইঁদ-ডাং' তুলে বৃষ্টিকে আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে, 'ইঁদ-ডাং' তোলবার সময় জাওয়া-ডালির অঙ্কুরিত চারা উৎসর্গ করে 'ইঁদ-ডাং'-কে অভিবাদন জানিয়ে শস্য কামনা করা হয়। আরও লোকবিশ্বাস, 'ইঁদ-ডাং'-এর দড়ি ধরে টেনে তোলবার সময় যদি দড়ির কোনো অংশ বা টুকরো হাতের মধ্যে চলে আসে, তাহলে সেই দড়ির অংশ ঘরের মধ্যে রাখলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। আবার, সেই দড়ির কোনো অংশ মাছ ধরবার ফাঁদে বা ঘুঘি-তে বেঁধে দিলে সাপ ঢুকে ঘুঘির মাছ খেতে পারবে না। 'ইঁদ-ডাং' ও 'ইঁদ দড়ি'-র সাহায্যে মাছ ধরার এই সংস্কারটির উল্লেখ ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করা আছে।

৫. জঙ্গলমহলের লোকচেতনায় শিব কৃষিদেবতা। উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা। কুড়মিদের কাছে তিনি 'বুঢ়হা বাপ'। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই ঘটবে চাষবাসের উন্নতি, শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি। এখানে শিবের পৌরাণিক আদল নেই। জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক কৃষি-নির্ভর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যে সকল দৈবশক্তিকে কৃষিকাজের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কল্পনা করে তাদের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন। করেছিল, শিব ঠাকুর তাদেরই একজন। জঙ্গলমহল জুড়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন শুরু হয়। চলে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথি পর্যন্ত। মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তি জঙ্গলমহল তথা সমগ্র ছোটনাগপুরের কুড়মি সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব হল ছাতু সংক্রান্তি বা ছাতু পরব। এই উৎসবের অন্যতম নেগাচার হল 'আঁশ পইড়ান'। দলবেঁধে বাঁধ, নদী, পুকুরে মাছ ধরে দুপুরে আম ও মাছের ঝোল সহযোগে মধ্যাহ্নভোজ করা হয়। এই লোকাচার প্রত্যেকটি কুড়মি পরিবারেই পালন করা হয়। কুড়মি সমাজকর্মী ও শিক্ষক বিপ্লব মাহাত এই নেগাচার প্রসঙ্গে বলেন, এই ছাতু উৎসবের ঐতিহ্যবাহী লোকাচার পালন করা হয় পূর্ব বিশ্বাস থেকেই। এই নেগাচারের পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও যথেষ্ট রয়েছে। গরমের সময় আম-মাছের ঝোল বা আম-ছাতু-গুড় খেলে পিত্ত, জণ্ডিস, মাথা ঘোরা প্রভৃতি থেকে উপশম পাওয়া যায়। ছাতু পেট ঠান্ডা রাখে ফলে ডায়েরিয়ার মতো রোগবালাই থেকেও মানুষ রক্ষা পায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের দাপটে যখন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক লোকায়ত সংস্কৃতিগুলি ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়ছে তখন জঙ্গলমহলের কুড়মি মানুষজনের নিজস্ব সামাজিক অনুশাসন এবং স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজও জিইয়ে রেখেছে এখানকার জীবনধারার পুরোনো আমেজ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত নস্টালজিয়ার যোগসূত্র!

(লেখক নিজে কুড়মি জনজাতির মানুষ। ছবি : লেখক)

।। বেরঙিন ।।

পবিত্র পাল

গ্রাম মফস্বলের দিকে 'LFS' থাকে না, বিশু কাকার মাছের দোকান থাকে, নরেনদার দোকানে পাঁচ টাকায় ফিল্মের কৌটোর এক কৌটো কেঁচো পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলা যতক্ষণ ইচ্ছা মাছ দেখা যায়, কিছু কিনলেও ভালোমন্দ দুটো কথা বলা যায়। আসলে এই ছোট ছোট রঙিন মাছের দোকানগুলো যেন একটা টাইম মেশিন। নোংরা ঝুলপড়া ছোটো ছোটো ঘুপচি। যেখানে আমারা বড় বড় ট্যাঙ্কের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম। যেখানে আমারা ঢুকলেই নব্বই কি আশির দশকে ফিরে যাই। দোকানের নাম যতই লোকনাথ কালারিং ফিশ সপ হোক না কেন, নরেন দা বা বিশু কাকারা কিন্তু আধুনিক লৌকিক জগতের থেকে বহুদূরে। বয়স হয়তো ষাটের কাছাকাছি। মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, কখনো উসকোখুশকো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা। বহু পুরোনো সব অ্যাকোয়ারিয়ামে কিছু অর্ডিনারী রঙিন মাছ নিয়ে এদের কারবার। এরা ফেসবুক বোঝেন না, হোয়াটসঅ্যাপ করেন না। এমনকি দাম জানতে চাইলে 'ইনবক্স বা PM -ও বলেন না। তাহলে কি বলেন? বলেন, বাবা ভালো আছো তো? নতুন একটা মাছ এনেছি, দেখে যেও। কোলকাতা থেকে একটা ভালো খাবার এসেছে, সময় পেলে নিয়ে যেও। সময় পেরিয়ে ছেলের বাবা হয়েছি ঠিকই, তবে এদের কাছে আজও সেই নব্বইয়ের বাচ্চাটাই রয়ে গেছি, যে হাফ প্যান্ট পড়ে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছ দেখতো। মাছের গল্প শুনতো। আসলে নরেনদা বা বিশুকাকারা যেন বহু পুরোনো বইয়ের কোন হলুদ হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠার ছোটগল্পের চরিত্র।

যাঁরা যৌবনের নেশাটাকে পেশা বানিয়ে টেনে টেনে জীবিকা নির্বাহ করে চলছেন। রঙিন মাছ বিক্রি করে সেভাবে চলে না, তবুও শখের বশে ভালোবেসে করে যাওয়া ব্যবসাটা ছাড়তেও পারেন না। এদের দোকানে বিদেশী আরোয়ানা বা বহুমূল্য নেটিভ স্নেকহেড পাওয়া যায় না। FO, F1-এর কনসেপ্ট থাকে না। কিন্তু থাকে সুবার্টি বার্বের গল্প, রেড টেইল সার্ক যখন প্রথম এলো কতো দাম ছিল সেই গল্প। আবলুট গোল্ডফিশ বললে আজকাল কেউ কিনতে চায় না এই আক্ষেপ যেমন থাকে, তেমনি থাকে ওয়াইল্ড ডিসকাস না দেখার আক্ষেপ। আসলে ভেবে দেখতে গেলে এই আক্ষেপটাই হয়তো সম্বল, এখনও কিছু করার, দোকানটাকে নতুন করে সাজানোর। কিন্তু সেসব আর হয়ে ওঠে না। বয়স বাড়ছে, তাছাড়া আজকাল ইন্টারনেটের যুগ, হাই টেকনোলজির প্ল্যান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম ঠান্ডা ঘরের গ্যালারিতে শোভা পায়, সেখানে এদের বড় বেমানান মনে হয়, বিবর্ণ লাগে।

এই যে দু-দুটো বছর ব্যবসা নেই, মানুষের হাতে পয়সাই নেই, শৌখিন মাছ কেনার সময় কোথায়! কেঁচো বেচে আর পাম্প সারিয়ে কতটুকুই বা চলে। তারপর মাছেরও যা দাম বাড়ছে খদ্দেরকে বলতে লজ্জা করে। মুখের উপর কিছু না বললেও, থাক বলে চলে যায়। শুনছি নতুন নতুন ছেলেরা যারা এই লাইনে এসেছে, তারা আজকাল ডেলিভারি দেয়। বয়স তো অনেক হলো আর কি সে ধকল সইবে? বাবার হাত ধরে যারা একসময় আসতো তারা কবেই মাছ পোষা ছেড়েছে। যারা এখনও পোষে তারা গ্যালিফ চেনে, হাওড়া, আমতলা সব জানে। চেন্নাই-মুম্বাই করতে পারে। বিশুকাকা বা নরেনদার সে ক্ষমতা কোথায়। ইমপোর্ট তো দূরের কথা একটু তিন অঙ্কের মাছ আনতেই ভয় হয়, যদি বিক্রি হতে মাসখানেক লেগে যায়, একগাদা টাকার ধাক্কা ...

আচ্ছা আপনার পাড়ায়ও নিশ্চয়ই এরকম নরেনদা বা বিশুকাকারা ছিলেন, কোথায় আছেন তাঁরা? লকডাউনে দোকান খোলেন? দোকনটা কি আদৌ চলছে, নাকি গ্লোবাল ফিশ ট্রেডিং-এর বিশ্ব বাণিজ্য কনসেপ্টের কাছে হার মানলেন?

আচ্ছা ওনারাও তো আমাদের মেছো হবির একটা অংশ। একটা নস্টালজিয়া, একটা জেনারেশন যাঁরা আমাদের ছেলেবেলায় রঙিন মাছের গল্প শুনিয়েছিলেন, মাছ চিনতে শিখিয়েছিলেন। হয়তো আগামী প্রজন্ম আমাদের ছোটবেলার মতো পুষবে না সেই কালচে উইডো বা নীলচে জেব্রা, তবুও এখনও কি আমরা পারি না, বিশুকাকাদের এই গল্পগুলো বাঁচিয়ে রাখতে? পারি না হলুদ বাল্বের আলো জ্বলা ঘুপচি টাইম ক্যাপসুলটায় ফিরে গিয়ে বলতে 'কাকা কতদিন আসা হয় না, দাও না কটা মাছ'।

হয়তো দাম দু-চারটাকা বেশি হবে। তবুও গ্লোবাল অর্নামেন্টাল ফিশ মার্কেটিং-এর সঙ্গে অসম যুদ্ধে পাড়ার 'শঙ্কর মুদিটা' তো জিতবে...

ছবি : অরিত্র ভট্টাচার্য্য ও ইন্টারনেট

Fireglow

MADE IN INDIA

21 WATTS | 6500K

AQUARIUM LIGHTING

REDEFINED

SHARE YOUR FEEDBACK AT

fireglowlighting@gmail.com